সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

ফেব্রুয়ারি ২০১৪

কিছুক্ষণ আরো না হয় রহিতে কাছে...

৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ ভারতবাংলা দেশ কবিতা উৎসবে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাই কমিশনার শ্রী পঙ্কজ সরন

৩০ জানুয়ারি, ২০১৪
চট্টগ্রাম: ভারতের
পোর্ট বেয়ারে অনুষ্ঠিত
'মিলন২০১৪ '-তে
অংশগ্রহণকারী
বি.এন.এস. সাঙ্গুর
বিদায় সমারোহ
অনুষ্ঠান

২৩ জানুয়ারি, ২০১৪
গুলশানের ইন্দিরা গান্ধী
সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে
মহান অভিনেত্রী প্রয়াত
সুচিত্রা সেনএর
চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর
উদ্বোধন

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

বর্ষ চলিশ | সংখ্যা ১০ | মাঘফা ল্গুন ১৪২০ | ফেব্রুয়ারি ২০১৪

শিক্ষা উন্নয়নে ভারত ভ্রমণ

গানের ভেলায় বেলা অবেলায়

সূচিপত্র

তুমি কোন গগনের তারা ০৪
দূরের নক্ষত্র ১০
প্রিয়তমা সুন্দরীতমা ১৩
রাজকুমারী ও কবিয়াল ১৭
আমার বাল্যবন্ধু ২১
কবিতা ২৪
বিদ্যাদেবী সরস্বতীর অর্চনা ২৬
ছোটগল্প: চাঁদের দেশে ২৮
শিক্ষা উন্নয়নে ভারত ভ্রমণ ৩১
উপন্যাস: নিঃসঙ্গ মানুষের কলমুখর সময় ৩৩
ছোটগল্প: শূন্যতার করতালি ৩৮
বাংলা ভাষার বিকাশ ও বিশ্বায়ন ৪১
গানের ভেলায় বেলা অবেলায় ৪৫
শেষ পাতা: শুভাপ্রসন্নর ছবি ৪৮

প্রিয়তমা সুন্দরীতমা

প্রিয়তমা সুন্দরীতমারে, যে আমার উজ্জ্বল উদ্ধার। বোদলেয়ার আর বুদ্ধদেব বসুর কাছে ক্ষমা চেয়ে সামান্য দু'টি শব্দ পাল্টাই, 'যে আমার' পাল্টে 'যিনি আমাদের' বলতে চাই, যিনি কেন না, এমন বিচ্ছুরিত সৌন্দর্য আমি আগে কখনো দেখিনি, যদিও আমি দেখিনি, তবু, বিনয়ের বহুবচন নয়, ভাল করেই জানি, তিনি লক্ষ-কোটি অনুরাগীর দৃষ্টিকে ভ্রান্ত করতেন। আর কী অসাধারণ ধারণা নিজের সম্পর্কে সেই রূপৈশ্বর্য তিনি দেবীদের মতই অনন্ত যৌবনা তাই দৃষ্টির আড়ালে গিয়েই টিকিয়ে রাখলেন। ইনি যে সুচিত্রা সেনই, তাও যদি আমার মুখ ফুটে বলতে হয়, তার চেয়ে দুঃখের কী হতে পারে!

শিল্প নির্দেশক ধ্রুব এষ
গ্রাফিক্স নূরন নাহার

মুদ্রণ গ্রাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন এন্ড প্রিন্টিং লি.
৫৫/১ পুরানা পল্টন ঢাকা-১০০০ ফোন ৯৫৫৪৮০৪

সম্পাদক নান্টু রায়
ফোন ৯৮৫০১৯৩-৭, ৯৮৮৮৭৮৯-৯১ এক্স: ১৪৯
ফ্যাক্স ৮৮-০২-৯৮৮২৫৫৫, e-mail: informa@hcidhaka.gov.in

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ভারতীয় হাই কমিশন
বাড়ি নং ২ সড়ক নং ১৪২ গুলশান-১ ঢাকা-১২১২

ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা ওয়েবসাইট: www.hcidhaka.gov.in; ভিজিট করুন আমাদের page: High Commission of India, Dhaka; ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের একাউন্ট: Iccr Dhaka

ভারতীয় জনগণের শুভেচ্ছাসহ বিনামূল্যে বিতরিত ভারত বিচিত্রায় প্রকাশিত সব রচনার মতামত লেখকের নিজস্ব– এর সঙ্গে ভারত সরকারের কোন যোগ নেই

এই পত্রিকার কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে ঋণস্বীকার বাঞ্ছনীয়

ভারতের ৬৫তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্‌যাপন
65th

সম্পাদকীয়

তাঁর চোখে স্বপ্ন ছিল, তাঁর চোখে মায়ার কাজল আঁকা ছিল। তাঁর চোখের ভাষায় আমরা প্রেমের পদাবলী খুঁজে পেতাম, তিনি আমাদের গ্রাম্যতা ভুলিয়ে আধুনিক করে তুলেছিলেন, তিনি আমাদের পুরুষ করে তুলেছেন। তিনি ছিলেন আমাদের পরমারাধ্য, চিরকাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন নায়িকা। তাঁর লোকান্তরের মধ্য দিয়ে বাংলা সিনেমার এক উজ্জ্বল অধ্যায়ের চিরযবনিকাপতন ঘটল।

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি? ফেব্রুয়ারি আমাদের অবধারিতভাবে মনে করিয়ে দেয় ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনের কথা। রফিক, শফিক, সালাম, বরকতের সেদিনের রক্তভেজা সরণী বেয়ে ১৯৭১ সালে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের অভ্যুদয় ঘটে বিশ্ব মানচিত্রে– বাংলাদেশ যার নাম। সেই অমর শহীদদের মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার আত্মবিসর্জনের স্বীকৃতি দিয়ে জাতিসংঘের শিক্ষা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক শাখা ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করে বিশ্বের তাবৎ বাঙালিকে পরম গৌরব ও সম্মান দান করেছে। ঢাকার তরুণদের সেদিনের আত্মত্যাগ বৃথা যায়নি, বরং ফুলেফস লে সহস্রধারায় বিকশিত পলবিত হয়েছে।

সেই বেদনাবিধুর ঘটনার দু'বছর পরে আরেকটি বেদনাবহ ঘটনার সাড়্গী হই আমরা। ১৯৫৪ সালে কলকাতার জনারণ্যে ট্রাম দুর্ঘটনায় একজন মানুষ প্রাণ হারান। মানুষটির চোখে স্বপ্ন আঁকা ছিল। সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি। এই মানুষটি কবি ছিলেন– নিভৃতচারী নিঃসঙ্গ একজন কবি। তারপর গঙ্গা দিয়ে কতজল গড়িয়ে গেছে, তাঁর প্রিয় ধানসিড়ি নদী বর্ষায় ঋতুমতী হয়েছে, শীতে নিঃস্ব হয়েছে, শঙ্খচিল শালিখের দেশে কার্তিকের নবান্ন এসেছে, কাঁঠাল পাতায় ভোরের কুয়াশা ঝরেছে টুপটাপ শব্দে, কবির আকাঙ্ক্ষা আবার আসিব ফিরে এই বাংলায় ফলবতী হয়েছে। নশ্বর কবি অতীন্দ্রিয়লোক থেকে ফিরতে পারেননি বটে কিন্তু তাঁর অবিনশ্বর কবিতা ফিরে এসেছে তীব্রভাবে, বাঙালির চৈতন্যে গভীর অভিঘাত সৃষ্টি করে। কবির নাম শ্রীজীবনানন্দ দাশ– জন্ম তাঁর ফেব্রুয়ারি মাসে।

তাঁরও বহুকাল আগে এই ফেব্রুয়ারিতেই জন্মেছিলেন এক মহাসাধক। সরল ভাষায় ধর্মতত্ত্বকে এই আত্মভোলা মহামানব ছড়িয়ে দিয়েছিলেন মানুষের মাঝে। আর তাঁর সুযোগ্য মন্ত্রশিষ্য সেই বাণী পৌঁছে দিয়েছিলেন বিশ্বের দরবারে। এই পুণ্যলগ্নে সেই পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণকে জানাই আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

তুমি কোন গগনের তারা

মলয়চন্দন মুখোপাধ্যায়

শেষ থেকে শুরু

সুচিত্রা সেন প্রয়াত হলেন ১৭ জানুয়ারি ২০১৪ শুক্রবার সকাল ৮.২৫-এ, কলকাতার বেল ভিউ নার্সিং হোমে। বয়স হয়েছিল তিরাশি বছর। ডায়াবেটিস, স্পন্ডেলাইটিস প্রভৃতি রোগ এবং বয়সজনিত শারীরিক ক্লেশ ও ফুসফুসের সংক্রমণ নিয়ে তিনি এখানে ভর্তি হন ২৪ ডিসেম্বর ২০১৩, সামান্য উন্নতি হলেও শেষ পর্যন্ত তিনি চলে গেলেন না ফেরার দেশে।

তেত্রিশ বছর আগে বাংলা সিনেমার মহানায়ক উত্তমকুমারও একই নার্সিং হোমে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। বাংলা ও হিন্দি চলচ্চিত্রে প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর অভিনয় শেষে যেদিন তিনি চলচ্চিত্রজগৎকে বিদায় জানিয়ে লোকচক্ষুর আড়ালে থাকার ইচ্ছে করলেন এবং তিন যুগ ধরে অন্তরালবর্তিনী হয়ে থাকতে সফল হলেন, তাঁর মৃত্যুর পর অতি উৎসাহীদের তাঁকে শেষ বারের মত দেখবার আকুলতার কাছে নতি স্বীকার করে তাঁর পরিবার সুচিত্রার প্রতি সম্মান প্রদর্শনে শিথিলতা দেখিয়ে ফেলতে পারেন, এমন আশঙ্কা ছিল। ভাগ্যক্রমে তা হয়নি। ফলে, সুচিত্রার শেষকৃত্য অনন্য মাত্রা পেয়ে গেল শোক, গাম্ভীর্য, রাষ্ট্রীয় সম্মান, জনসাধারণের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন এবং সর্বোপরি শৃঙ্খলাবোধের অনবদ্য প্রকাশে।

আমি কিংবদন্তির কথা বলছি

১৯৭৮ সালে যাঁকে শেষবারের মত শুটিংএ দেখা গেছে, তাঁকে নিয়ে কী অভাবিত আবেগ! ভারতবর্ষ, পশ্চিমবঙ্গ বা বাংলাদেশে প্রতিভাময়ী অভিনেত্রীর অভাব নেই। পশ্চিমবঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের নায়িকারা কী অসামান্য অভিনয়ের নিদর্শন রেখেছেন, তবু সুচিত্রার মত হৃদগত করে কোন অভিনয়শিল্পীকে নেয়নি তাঁর ছবির প্রজন্মপ্র জন্মান্তরের দর্শকেরা। দেবিকারানী, কাননদেবী, সন্ধ্যারানী, ছায়াদেবী, যমুনা বড়ুয়া, বিনতা রায়, স্মৃতিরেখা বিশ্বাস তাঁদের অবিস্মরণীয়তা ম্লান হতে দেননি আজও কিন্তু স্বপ্নের নায়িকা তাঁরা কেউ হতে পারেননি। ঢাকায় কত যে সেলুন ছিল সে সময় 'সুচিত্রা' নামে, যেখানকার সাইন বোর্ডে লেখা থাকত 'এখানে উত্তমরূপে চুল ছাঁটা হয়'! ছবির জগৎ থেকে স্বেচ্ছানির্বাসন নেবার পর তিনি বহির্জগৎ থেকে অন্তরালবর্তিনী হলে তাঁকে নিয়ে গত পঁয়ত্রিশ বছরে লক্ষ গল্পকথা, পরীকথা তৈরি হয়েছে। অনিচ্ছুক বিবাহে জড়িয়ে পড়ে মাত্রই পনের বছর বয়সে তাঁকে কলকাতায় চলে আসতে হয়। পরে মাত্রই একবার সুযোগ হয়েছিল তাঁর ইছামতীপ্র দ্মার যুগ্মতার প্রশ্রয়ধন্য পাবনায় আসার। তারপরে তো ১৯৪৭এর দেশ ভাগ, যে জন্য তাঁর বাবামাভাই বোন সবাইকেই পাবনা ছাড়তে হয়। পদ্মা আর ইছামতী, যেন রবীন্দ্রনাথ আর বিভূতিভূষণের দ্বৈততায় নির্মিত কিংবদন্তি তিনি। দ্বৈততা তো জীবনভরই লক্ষ্যণীয় তাঁর মধ্যে। হতে চেয়েছিলেন সঙ্গীতশিল্পী, হলেন অভিনেত্রী। দাম্পত্য আর বিচ্ছেদ, প্রবল জনপ্রিয়তা আর ব্যবসায়ী স্বামীর সঙ্গে নিয়ত সংঘাত, তারকার উচ্ছলতা আর অধ্যাত্মএষণা, বৈপরীত্যে ভরা তাঁর ব্যক্তিজীবন।

গ্রেটা গার্বোর সঙ্গে বেশ কিছু মিল রয়েছে সুচিত্রার। দুজনেই দ্বৈত চরিত্রে অভিনয় করেছেন যথাক্রমে *Two Faced Woman* (১৯৪১) আর *উত্তর ফাল্গুনী*তে (১৯৬৩)। দুই অভিনেত্রীকেই ছবি দু'টিতে নাচতে হয়েছে। অবসরগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেবার পর গার্বোর কাছে প্রস্তাব আসে মার্শেল প্রস্তএর ধ্রুপদী উপন্যাস Remembrance of Things Past ছবিতে অভিনয়ের, তেমনি সুচিত্রাকে নিয়ে টলস্টয়ের ক্লাসিক সৃষ্টি Ressurrectionএর ছায়া অবল ম্বনে ছবি করবার কথা ভেবেছিলেন ঋত্বিক ঘটক। স্বভাবতই তা বাস্তবায়িত হয়নি। গার্বো ও সুচিত্রা দুজনেই ছবি করতে এসেছিলেন অল্পবয়সে, তাই উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি কারোই। দুজনের কেউই সাক্ষাৎকার দেওয়া একেবারেই পছন্দ করতেন না। গার্বোর কাছে যুক্তিটা ছিল এরকম, I feel able to express myself only through my roles, not in words, and that is why I try to avoid talking to the press. শোনা যায়, একবারমাত্র তিনি সংবাদমাধ্যমকে সাক্ষাৎকার দিয়ে ছিলেন। সুচিত্রার অনীহা, এ ব্যাপারে, প্রকৃত প্রস্তাবে অব্যাখ্যাত। ক্বচিৎ দু'একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন তিনিও। সুচিত্রা দিতেন তবুও, গার্বো অটোগ্রাফ পর্যন্ত দিতেন না কাউকে, যোগ দিতেন না কোন ছবির প্রিমিয়ারে, চিঠি লিখতেন না ফ্যানদের। চিঠি এলে পড়েও দেখতেন না। গার্বোর দেশ সুইডেন ভোলেনি গার্বোকে, সুচিত্রার জন্মস্থান পাবনা তথা বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশও ভোলেনি সুচিত্রাকে। আরো এক সমাপতন ৬ এপ্রিলকে নিয়ে– ঐদিন সুচিত্রার জন্মদিন, আর ২০১১এর ৬ এপ্রিল সুইডিশ সরকার ঘোষণা দেয় গার্বোর ছবি থাকবে সুইডেনের ১০০ ক্রোনার নোটে।

সুচিত্রার ব্যক্তিজীবন এমন গোপনতায় আচ্ছন্ন ছিল যে, শুধুমাত্র কল্পনা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না আমাদের। তাঁর লেখা চিঠি, তাঁকে লেখা চিঠি, হয়তো আছে, তবে জীবৎকালে তা লোকচক্ষুর অন্তরালেই রয়ে গেছে। দুই সাংবাদিক অমিতাভ চৌধুরী এবং গোপালকৃষ্ণ রায়ের কাছে তিনি অতীব অন্তরঙ্গ ছিলেন। তাঁরা দুজনেই তাঁদের বইয়ে তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন কিন্তু সে গ্রন্থপাঠে সুচিত্রা সম্পর্কে যতটা ওয়াকিবহাল হওয়া যায়, তাঁর সম্পর্কে রহস্য আর ধোঁয়াশা তৈরি হয় আরো বেশি। বছরের পর বছর দেখে, তাঁর সঙ্গে কুড়ি বছরের ওপর অন্তরঙ্গতা সত্ত্বেও গোপালকৃষ্ণ এটুকুই জানাতে পারেন যে মুনমুন জন্মাবার আগে সুচিত্রার একটি পুত্রসন্তান হয়েছিল, বাঁচেনি। গোপালকৃষ্ণকে দেওয়া একটি একান্ত সাক্ষাৎকার রয়েছে সুচিত্রার, আজও অপ্রকাশিত। যদি কোনদিন তা প্রকাশ পায়, হয়তো সুচিত্রার জীবনের লৌহযবনিকা ঘুচবে। চলচ্চিত্র থেকে সরে আসার যথার্থ কারণ কী, সে বিষয়েও নীরব সুচিত্রা। সুচিত্রার ঘরে যামিনী রায়ের ছবি ছিল, তবে মেয়ে মুনমুনকে চিত্রশিল্পী বানানোর অভীপ্সায় তাকে পরিতোষ সেনের মত শিল্পীর ছাত্রী বানালেও সুচিত্রার শখ ছিল ছবিতে নয়, বাগান নির্মাণে।

সুচিত্রার মৃত্যুতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে নিয়ে দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখতে বসেন, তিনি আবালবৃদ্ধবনিতা বাঙালির একাধারে সুদূর, অন্যদিকে একান্ত নিকটজন। উত্তমকুমারের সঙ্গে মনোমালিন্যে দার্জিলিং থেকে শুটিং ফেলে (সেখানে আউটডোর ছিল *শিল্পী* ছবির) স্বামীকে নিয়ে কলকাতা চলে আসেন, আর এজন্য ছ'মাস বন্ধ থাকে এ ছবির চিত্রায়ন। সত্যজিৎ রায়ের ছবি প্রত্যাখ্যান করেন, কেননা সত্যজিৎ শর্ত দিয়েছিলেন, *দেবী চৌধুরানী* করার সময়পর্বে তিনি অন্য কোন ছবিতে অভিনয় করতে পারবেন না। বাংলা ও হিন্দিতে যথাক্রমে *উত্তরফাল্গুনী* আর *মমতা*র পরিচালক ছিলেন অসিত সেন। তাঁকে তিনি

নির্দ্বিধায় 'স্কাউন্ড্রেল' বলে দিতে পারেন। আবার তিনিই অসুস্থ ঋত্বিক ঘটককে অর্থ সাহায্য করেন গোপনে। ১৯৬৩ তে মস্কো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সেরা নায়িকার পুরস্কার পান তিনি, যেখানে আবার সত্যজিৎ রায়ই জুরির আসনে! কেবল তাই নয়, জুরি মহাশয় কলকাতায় ফিরে সুচিত্রার রিসেপশন পার্টিগুলোতেও সস্ত্রীক গিয়েছেন। তাঁর মনের আরাম, আত্মার শান্তি ছিল বেলুড়মঠে স্বামী বিবেকানন্দের উত্তরসূরিদের সান্নিধ্যে। সেখানকার মহারাজের কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন তিনি। রামকৃষ্ণ-সারদামা থাক তেন তাঁর নিয়ত অনুধ্যানে। পাশাপাশি বীরভূমের শক্তিপীঠ কঙ্কালীতলায় যেতেন তিনি, যেতেন কালীঘাটের কাছে এক পীরসাহেবের কাছেও।

না, এসবের মধ্যে কিংবদন্তি নেই, আছে অন্যত্র। আজও কলকাতা হাইকোর্টের এগারো নম্বর রুম অপরিবর্তিত রেখে দেওয়া হয়েছে, দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পর। *উত্তর ফাল্গুনীর* বিচার দৃশ্য চিত্রায়িত হয়েছিল এখানে। পরবর্তীকালে এখানে আর কোন চলচ্চিত্রের দৃশ্যগ্রহণের অধিকার কাউকে দেওয়া হয়নি। মা ও মেয়ের দ্বৈত চরিত্রে এখানে অভিনয় করেছিলেন সুচিত্রা সেন। মারুপিণী পান্নাবাইয়ের মৃত্যুদৃশ্যটিও তোলা হয়েছিল এখানে। পরিচালক ছবিতে অনেকানেক আইনজীবীকেও কোর্ট দৃশ্যে উপস্থিত দেখান। জুরিদের বসার জায়গাসমেত সমস্ত সেশনস কোর্টটিকে হুবহু একই আসবাবসমন্বিত রেখে দেওয়া হয়েছে। ইতিহাস ও কিংবদন্তির মিতালি, নয়?

তুমি কি কেবলি ছবি?

ছবি করেছেন তিনি কমবেশি ষাটটি। তার মধ্যে সাতটি হিন্দিতে, বাকিগুলি বাংলায়। ১৯৫৩ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি তাঁর যে ছবিটি প্রথম রিলিজ হয়, সুকুমার দাশগুপ্ত পরিচালিত সে ছবির নায়ক সমর রায়। এ ছবিতে ছিলেন উত্তমকুমারও, অরুণকুমার নামে। এর আগে তাঁর যে ছবিটির কথা জানতে পারি আমরা, তার নাম *শেষ কোথায়*। সেটি কোনদিন প্রদর্শিত হয়নি। তাঁর শেষ যে ছবিটি মুক্তি পায়, সে ছবির নাম *প্রণয় পাশা*। ছবিটির মুক্তির তারিখ ৯ জুন ১৯৭৮। ছবির নায়ক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। মোট তিপ্পান্নটি বাংলা আর সাতটি হিন্দি, এই মোট ষাটটি ছবিতে অভিনয় করেন পঁচিশ বছরব্যাপী অভিনয়জীবনে। সুচিত্রার বিপরীতে বাংলা ছবিতে যাঁরা অভিনয় করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রধান উত্তমকুমার। মোট তিরিশটি ছবিতে উত্তমকুমার সুচিত্রার নায়ক। সুচিত্রার বিপরীতে বিকাশ রায় করেন সাতটি ছবি, বসন্ত চৌধুরী চারটি ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় তিনটি। সমর রায়, রবীন মজুমদার, প্রশান্তকুমার, দীপক মুখোপাধ্যায়, অশোককুমার, রঞ্জিত মলিক, শমিত ভঞ্জ এবং উৎপল দত্তের সঙ্গে তাঁর ছবি একটি করে। *কাজরী* ছবিটি ছিল নায়কবর্জিত। যে সাতটি হিন্দি ছবি করেন, তার মধ্যে দু'টিতে তাঁর বিপরীতে ছিলেন দেব আনন্দ (*বোম্বাই কা বাবু*, ১৯৬০), শারহাদ (১৯৬০)। *দেবদাস*এ (১৯৫৫) দিলীপকুমার, *মুসাফির* (১৯৫৭), *চম্পাকলি* (১৯৫৭), *মমতা* (১৯৬৬) আর *আঁধি* (১৯৭৪)তে যথাক্রমে শেখর, অশোককুমার, ধর্মেন্দ্র ও সঞ্জীবকুমার।

পরিচালকদের মধ্যে অজয় কর তাঁকে নিয়ে করেছেন ছ'টি ছবি, অগ্রদূত (বিভূতি লাহা) ঐ একই সংখ্যক। সুকুমার ভট্টাচার্য তিনটি, নীরেন লাহিড়ী, দেবকীকুমার বসু, বিজয় বসু, পিনাকী মুখোপাধ্যায় আর সুশীল মুখোপাধ্যায় দু'টি করে ছবি করেন। অসিত সেনও বাংলাহিন্দি মিলিয়ে তিনটি। হরিসাধন দাশগুপ্ত, সলিল সেন, দীনেন গুপ্ত, মঙ্গল চক্রবর্তী, হীরেন নাগ, নির্মল দে, নরেশ মিত্র, চিত্ত বসু ও বেশ কিছু অখ্যাত পরিচালক একটি করে। সত্যজিৎ রায়, রাজকাপুর, ঋত্বিক ঘটক ইচ্ছে থাকলেও সুচিত্রাকে নিয়ে ছবি করতে পারেননি। পুর্ণেন্দু পত্রী *চতুরঙ্গ* শুরু করেছিলেন, কিন্তু তাঁর শুটিং শুরু হওয়ার তিনদিনের মাথায় প্রযোজক হেমেন গঙ্গোপাধ্যায় সুইসাইড করায় সুচিত্রার রূপায়ণে রবীন্দ্রনাথের দামিনীকে দর্শকরা আর দেখতে পেল না। সত্যজিৎ রায় *ঘরে বাইরে*ও করবেন তাঁকে নিয়ে, কথা ছিল। নানা কারণে হয়নি। বহু বছর (আসলে *পথের পাঁচালী* করারও আগে থেকে এ ছবি করার ইচ্ছে ছিল তাঁর) পরে, তাঁর পরিচালকজীবনের প্রায় অন্তিমে সে ছবি করলেন সত্যজিৎ, কিন্তু ১৯৮৩৮৪- তে সে ছবি তোলা হয় যখন, সুচিত্রা স্বভাবতই বিমলা রূপায়িত করবার চেহারায় নেই। জীবনে রবীন্দ্রনাথের গল্পউপন্যাসের চরিত্রে অভিনয় করা হয়নি তাঁর। *চতুরঙ্গের* দামিনী চরিত্রটি করার জন্য তিনি এতটাই প্রলুব্ধ ছিলেন যে তাঁর বিশেষ বন্ধু সাংবাদিক, রবীন্দ্রঅনুধ্যায়ী এবং ছড়াকার অমিতাভ চৌধুরীকে তিনি উপন্যাসটির নাট্যরূপ দিতে বলেছিলেন, মঞ্চে অভিনয় করবেন তিনি। এমনিতে কোনদিনই মঞ্চাভিনয়ে আগ্রহ দেখাননি তিনি। অমিতাভ চৌধুরী নাট্যরূপ দেননি শেষ পর্যন্ত, তাই দামিনী চরিত্র রূপায়ণ চির আকাঙ্ক্ষাকাণতই থেকে গেল তাঁর। অন্যদিকে সত্যজিতের পরিচালনায় না করলেও দীনেন গুপ্ত তাঁকে নিয়ে করেছিলেন *দেবী চৌধুরানী*। স্বস্তি ছিল তাতে সুচিত্রার?

সেসময়ের তরুণ মজুমদার, পার্থপ্রতিম চৌধুরী, মৃণাল সেন, ইন্দর সেনরা তাঁকে নিয়ে ছবি করার ভাবেননি, ভাবতে অবাক লাগে। বাংলাদেশেও ছবির সূত্রে তাঁর কোন যোগাযোগ হয়নি, এও একটু অদ্ভুত ব্যাপার। বিশেষ করে '৭১ পরবর্তী বাংলাদেশ তাঁকে কি ছবি করতে আহ্বান জানায়নি, না ছবি করতে রাজি হননি তিনি?

তপন সিংহ কিন্তু তাঁর লেখায় সুচিত্রা প্রশস্তি যথাযথভাবে করে গিয়েছেন। কেবল তাই নয়, তাঁর লেখায় তিনি সত্যজিৎ রায়ের উদ্ধৃতি ব্যবহার করে এমন একটি তথ্যের সর্বাতিশয় প্রমাণ করেছেন, যাতে উত্তমসুচিত্রা জুটির ঐতিহ্য প্রতিযোগিতাহীন হয়ে পড়ে। তপন সিংহ লিখছেন, 'বাঙালিদের ঘরে ঘরে উত্তমসুচিত্রার নাম। সত্যজিৎবাবু বলতেন, এত বড়ো রোমান্টিক জুটি পৃথিবীতে হয়নি।' এ প্রসঙ্গে তপন সিংহ হলিউডের দু'টি ছবি *রোমান হলিডে* আর *সাউন্ড অফ মিউজিক*এর উলেখ করেন। লেখকের মতে, ছবি দু'টি পৃথিবীর অন্যতম সেরা রোমান্টিক ছবি। তারপর তপন সিংহের সংযোজন, 'দুটোই কালজয়ী সৃষ্টি। কিন্তু উত্তমসুচিত্রার মত জুটি এতদিন ধরে মানুষকে আনন্দ দিয়েছিল, পৃথিবীর কোন রোমান্টিক জুটি এতদিন স্থায়ী হয়নি।'

ছবির নায়িকা হিসেবে উত্তমকুমারের নাম সুচিত্রার সঙ্গে

ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। তবু কিন্তু তাঁর সৌভাগ্যলিপির যথার্থ পাঠ নিতে যার নাম নিতে হবে, তিনি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। সত্যজিৎ রায়ের এই একান্ত পছন্দের অভিনেতার বিপরীতে *সাত পাকে বাঁধা* ছবিতে অভিনয় করেই মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর শিরোপা পান তিনি। তবে তার আগে দেবকী কুমার বসুর *ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য* ছবিটির জন্যও বিদেশে প্রশংসিত হয়েছিলেন সুচিত্রা। আবার, উত্তমকুমারের সঙ্গে সুচিত্রার *সাগরিকা* সবচেয়ে বেশিদিন চলেছিল, ২৪ সপ্তাহ। অন্যদিকে সুচিত্রা-সৌমিত্র অভিনীত *দত্তা* চলেছিল ২৩ সপ্তাহ। তাই অন্তত এ ক্ষেত্রে সৌমিত্র ছিলেন উত্তমকুমারের নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী। *দত্তা* এক অর্থে *সাড়ে চুয়াত্তর* (১৯৫৩, ৮ সপ্তাহ), *অগ্নিপরীক্ষা* (১৯৫৪, ১৫ সপ্তাহ), *শাপমোচন* (১৯৫৫, ১১ সপ্তাহ), *হারানো সুর* (১৯৫৭, ১২ সপ্তাহ), *সপ্তপদী* (১৯৬১, ১৫ সপ্তাহ), *গৃহদাহ* (১৯৬৭, ১৫ সপ্তাহ) ছবিগুলিকে হারিয়ে দেয়।

তবে হ্যাঁ, অন্য একটি হিসেবও রয়েছে। উত্তমসুচি ত্রার ছবিগুলি প্রেক্ষাগৃহে বারবার মুক্তি পেয়েছে। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ, বছরের পর বছর পাড়ায় পাড়ায় সামিয়ানা টাঙিয়ে ১৯ পয়সার বিনিময়ে যে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা ছিল বিশেষ করে ১৯৭৫এর কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের প্রাকদূরদর্শনের যুগে, সেখানে উত্তমসুচি ত্রার ছবি প্রদর্শিত হত বেশুমার। তারপর যখন *দূরদর্শন* এল, এল হরেক স্যাটেলাইট চ্যানেল, এঁদের ছবির জনপ্রিয়তা যে কোন উত্তুঙ্গতা স্পর্শ করল এবং করে চলেছে, তা রীতিমত গবেষণার বিষয়।

কী এমন রসায়ন চেহারা, অভিনয়, কাহিনির বিষয়বস্তু, সঙ্গীত আর দেশীয় ঘরানা মিলিয়ে, যার জন্য জনপ্রিয়তার শীর্ষে তিনি? এমন একটা সময়ে সুচিত্রা বাংলা চলচ্চিত্রে অভিনয় করতে আসেন, নানাদিক থেকেই যে সময়টি ছিল ক্রান্তিকাল ও একই সঙ্গে তাৎপর্যবাহী। এই উপমহাদেশে চলচ্চিত্রের জনক হীরালাল সেনের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা, ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রথম যুগের স্বনামখ্যাত চিত্রপরিচালক বিমল রায়ের সঙ্গে (বিমল রায় *দেবদাস* ছবিতে পার্বতীর ভূমিকায় সুচিত্রাকে অভিনয় করিয়ে তো অবিস্মরণীয় করে গেছেন তাঁকে) কিংবা সুখ্যাত আলোকচিত্রশিল্পী, যাঁকে রেনেয়ার ছবি The River-এ ক্যামেরাম্যান হিসেবে দেখা গেছে, সেই রামানন্দ সেনগুপ্তের সঙ্গেও যে সুচিত্রার আত্মীয়সম্পর্ক, এতসব সমাপতন মিলিয়েও আমরা ব্যাখ্যা করতে অক্ষম কেন সুচিত্রা চলচ্চিত্রে আবির্ভাবের প্রায় শুরু থেকে অভিনেত্রী হিসেবে স্থায়ী আসনটি করে নিতে পারলেন। এর পেছনে যে ঐতিহাসিকঅর্থনৈতিকসামাজিক কার্যকারণগুলি ক্রিয়াশীল ছিল, আমরা সেগুলো বিশেষণ করে দেখতে পারি।

বিষয় চলচ্চিত্র: আজ কাল পরশুর গল্প

বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে নির্বাক ও সবাক যুগের কালপর্বে নিউ থিয়েটার্সের ঐতিহ্য ও সংকল্পের অবসানে ১৯৪৭এ, অর্থাৎ স্বাধীনতার বছরেই সত্যজিৎ রায়, হিরণকুমার সান্ন্যাল চিদানন্দ দাশগুপ্ত প্রমুখ প্রতিষ্ঠা করেন ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি। ১৯৫০এ তাঁদের মুখপত্র বেরোল, *চলচ্চিত্র*। বিদেশী ছবি দেখার সুযোগ এর ফলে উন্মুক্ত হল। ৫২-তে অনুষ্ঠিত হল আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব, এ দেশে প্রথম কলকাতায়। সত্যজিৎ এ বছরেই শুরু করেন *পথের পাঁচালী*র কাজ, যা মুক্তি পায় ১৯৫৫-তে। প্রাক '৪৭ বাংলা চলচ্চিত্র যেসব পরিচালক-প্রযোজকঅভিনেতাঅভিনেত্রীর দ্বারা মূলত প্রভাবিত হত, তাঁরা স্থানচ্যুত হচ্ছিলেন ক্রমশ। বিশ শতকের প্রথম চলিশ বছর ছিল নির্বাক ছবির যুগ। প্রথম সবাক ছবি নির্মিত হয়েছিল ১৯৩৯এ, তবু এরপ রেও নির্বাক ছবির পর্যায় পুরোপুরি শেষ হয়ে যায়নি। কেবল বাংলায় নয়, অখণ্ড বাংলাদেশে তৈরি নির্বাক ছবি গোটা উপমহাদেশেই জনপ্রিয় ছিল, কেননা ছবি গুলিতে ইংরেজি, হিন্দি, উর্দু প্রভৃতি সাবটাইটেল থাকত। সেসময় *নিউ থিয়েটার্স* ছিল ভারতবর্ষব্যাপী সম্ভ্রান্ত চিত্রনির্মাণ সংস্থা। দেবকীকুমার বসু, নীতিন বসু, হেমচন্দ্র, অমর মলিক, মধু বসু, প্রমথেশ বড়ুয়া প্রমুখ পরিচালকদের হাতে তৈরি হচ্ছিল পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও ক্বচিৎ কিছু কিছু সামাজিক ছবি। সতু সেন, তিনকড়ি চক্রবর্তী, জ্যোতিষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ পরিচালকেরাও ছিলেন। একইসঙ্গে বাণিজ্যসফল এবং শিল্পসম্মত ছবি তৈরির খ্যাতি ছিল এসব পরিচালকের। বিদেশ থেকে চিত্রবিদ্যা শিখে আসার প্রবণতা হীরালাল সেন, দাদাসাহেব ফালকের মত চলচ্চিত্রপরিচালনার পথপ্রদর্শকদের সময় থেকেই ছিল, পরবর্তীকালে প্রমথেশসতু সেনরা এই ধারা অ ক্ষুণ্ন রাখেন। ফিল্ম রিয়ালিটি নিয়ে এলেন বিমল রায় তাঁর *উদয়ের পথে* ছবিতে। তাঁর *দো বিঘা জমিন*, খাজা আহমদ আব্বাসের *ধরতী কি লাল* (৫০এর দুর্ভিক্ষ নিয়ে তোলা), নিমাই ঘোষের *ছিন্নমূল* ছবির মাধ্যমে বাংলা ও হিন্দি ছায়াছবি সাবালত্ব অর্জন করতে থাকে।

অভিনেতাঅভিনেত্রীদের মধ্যে প্রথম যুগে ছিলেন চারু রায়, হিমাংশু রায়, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অহীন্দ্র চৌধুরী, নরেশ মিত্র, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, জীবেন বসু, ইন্দুবালা, প্রভা দেবী, পদ্মা দেবী, দেবিকারানী, চন্দ্রাবতী দেবী, মলিনা দেবী, কানন দেবী প্রমুখ।

যুগসন্ধিক্ষণ। সত্যজিৎজায়া বিজয়া রায় ছবি করছেন বম্বে গিয়ে, সে-ছবির প্রদর্শনীতে সদ্য বিবাহিতা বিজয়ার আহ্বানেও উপেক্ষা দেখাচ্ছেন *পথের পাঁচালী* নিয়ে ছবি করার ভাবনায় আচ্ছন্ন সত্যজিৎ। অথচ ছবির পরিচালক সত্যজিতেরই কাকা নীতিন বসু।

সদ্যস্বাধীন দেশ তখন সংস্কৃতির যাবতীয় অঙ্গনেই নতুনের সন্ধান করছিল। নাটক, কথাসাহিত্য, চিত্রকলায় লেগেছে নতুন জোয়ার। সমান্তরালভাবে ঢাকাতেও নতুন যুগের সূচনা হচ্ছে। সুচিত্রা সেনের আবির্ভাব স্বভাবতই ছিল ইতিহাসের গতিপথে অবধারিত ও স্বাভাবিক।

এই বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর...

বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে উত্তমকুমার এবং সুচিত্রা সেন সমবেতভাবে এবং পাশাপাশি স্বতন্ত্রতা নিয়ে অনন্য। ঋত্বিক ঘটক সুচিত্রা সেনকে নিয়ে কী উত্তুঙ্গ মন্তব্য করেছেন দেখা যাক। 'রমা একটা বিরাট উঁচুতে উঠে গেল তার নিজের বেছে নেওয়া পথে।... এটা জানি রমা তার সমস্ত সম্ভাবনা পূর্ণ করে এখন, এখনই একমাত্র, গর্বিতা রানীর মত স্বপ্রকাশ ক্ষমতা অর্জন করেছে। এখন যা করবে, যদি করে, এবং যদি তেমন

পরিচালকের হাতে পড়ে, ফাটাবে। ...একমাত্র এই মেয়েটিরই আছে প্রাণান্ত সাধনা করে সেই প্রাতঃস্মরণীয় স্মৃতি মনে পড়িয়ে দেবার।' এই প্রাতঃস্মরণীয় স্মৃতি প্রভা দেবীর। [প্রভা দেবীর অভিনয় প্রতিভা সম্পর্কে শোভা সেন লিখছেন, 'তিনি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী ছিলেন, একথা অনেক বিদগ্ধজন বলে গিয়েছেন।... একমাত্র পূর্ব জার্মানির ব্রেশটএর স্ত্রী শ্রীমতী হেলেনেভাইগেলএর অভিনয় দেখে আমার মনে হয়েছিল, অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীকে দেখেছি। ভাইগেল সম্পর্কে উৎপল দত্ত: The first lady of the world theatre.] অতএব স্বভাবতই স্বতন্ত্র সুচিত্রা।

আমরা এর সঙ্গে উত্তমকুমারের স্বতন্ত্রতা, অনন্যতার খোঁজ নেব। সত্যজিৎ উত্তমকুমারকে মাথায় রেখে *নায়ক* ছবির চিত্রনাট্য লিখেছিলেন।

নায়ক ছবিতে পরিচালকের ত্রুটি পরে অস্বস্তিতে ফেলেছিল সত্যজিৎকে, কিন্তু উত্তমকুমার তাঁর অভিনয়ে ষোল আনা পারফেক্ট, মন্তব্যটি স্বয়ং সত্যজিতের। যে রাতে উত্তম প্রয়াত হন, স্ত্রী বিজয়া রায়ের কাছে তাঁর আক্ষেপোক্তি, 'ওকে আরো কিছু ছবিতে ব্যবহার করার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু তা আর হল কই!'

এই সুচিত্রা, এই উত্তম– দু'জনে নায়ক-নায়িকা হিসেবে যে তিরিশটি ছবিতে অভিনয় করলেন, বাংলা সিনেমার ইতিহাসে নান্দনিকতার অন্যতর মাত্রা যোগ করল সে-সব ছবি। তাঁরা যখন সিনেমা জগতে জাঁকিয়ে বসেছেন, ভারতীয় ও বিশ্ব চলচ্চিত্র ততদিনে স্টার সিস্টেমের জন্ম দিয়ে ফেলেছে। এর পেছনে সক্রিয় ছিল পুঁজিবাদের নিজস্ব যাত্রাপথ। পুঁজিবাদের অন্তিমপর্বে বিনোদনের ব্যাপক আয়োজন নিয়ে এল দূরদর্শন। উত্তম-সুচিত্রার তারকা হয়ে ওঠা ছিল আসলে পুঁজিবাদ বিকাশেরই সমরেখায় অবস্থিত।

মোট ষাটটি ছবি করেন সুচিত্রা, যার মধ্যে উত্তম ছিলেন অর্ধেকসংখ্যক ছবিতে তাঁর বিপরীতে। পুঁজিবাদের অভিযাত্রায় সঙ্গীত, শিল্পকলা ও অন্যান্য কলামাধ্যম যেমন চরিত্রগতভাবে পাল্টে গেল বিশেষ করে বৈষয়িক তথা আর্থিক দিক থেকে, চলচ্চিত্রশিল্পও তেমনি বদলাল। এর ফলে প্রতিযোগিতা বাড়ল সব ক্ষেত্রেই। চলচ্চিত্র বিনোদনের মাধ্যমে পরিণত হতে শুরু করল, যা চলচ্চিত্রসাধনার দিকপালদের অন্বিষ্ট ছিল না।

আমরা সুচিত্রার চলচ্চিত্রজয়ের আয়ুধ হিসেবে এক অপার সৌন্দর্যময়ী নারীর রূপকে প্রধান বলে বিবেচনা করতে চাই, যে রূপ আবার নৃতত্ত্বের দিক থেকে বাঙালিমানসের নন্দনপরিসীমার কেন্দ্রে। তাঁর সৌন্দর্য একাধারে মানবী, আবার যুগপৎ প্রত্নপ্রতিমা যেন তিনি, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। নারীপুর ব্যনির্বিশেষে তাঁর সৌন্দর্যে বিমোহিত, ফলে সহজেই সপ্রমাণ করা যায়, লাবণ্য, কিটস যাকে বলেছেন, Fine excess, আর ভারতীয় আলঙ্কারিকেরা যাকে বিবেচনা করেন মুক্তাফলেরর আভা বলে, সুচিত্রার সৌন্দর্যের পরিচায়িকা। লাবণ্য, যৌনতা নয়।

এই লাবণ্যে বাঁধা পড়লেন তাঁর অগণিত দর্শক, এবং তাঁর সহাভিনেতা উত্তমকুমার। স্পর্শকাতর, তবু দুঃসাহসী সুচিত্রার দাবি, ছবির ক্যাপসানে আগে তাঁর নাম থাকতে হবে, পরে উত্তমকুমারের। স্পর্ধাযোগ্য সুচিত্রার দ্বিতীয় দাবি, উত্তমের চেয়ে তাঁকে সম্মানদক্ষিণা বেশি দিতে হবে। তার পরেও, *শিল্পী* ছবির আউট ডোরে দার্জিলিং গিয়ে সুচিত্রার ইচ্ছে বিঘ্নিত হয়েছিল বলে শুটিং মাঝপথে থামিয়ে তিনি কলকাতা ফিরে আসেন। দীর্ঘ ছ'মাস লেগেছিল সুচিত্রার ক্রোধ গলনাঙ্কে পৌঁছতে। দুএকবার তো বাক্যালাপ বন্ধ করে বসে আছেন সুচিত্রা, হ্যাঁ, উত্তমের সঙ্গে। অথচ পাশাপাশি তাঁদের রোমান্টিক দৃশ্য চিত্রায়িত হচ্ছে। এইসব একদিকে, অন্যদিকে উত্তমকুমার জানাচ্ছেন, সুচিত্রা না এলে তিনি উত্তমকুমার হতে পারতেন না। সুচিত্রার মস্কো-স্বীকৃতিতে ফুলের তোড়া পাঠানোয় ত্রুটি হয় না উত্তমের। সুচিত্রাকে নায়িকা হিসেবে পেয়ে উত্তমের মন্তব্য, 'তাঁর আগে তো অন্য নায়িকাদের সঙ্গে প্রেমের ডায়লগ বলতে গিয়ে মনের মধ্যে কোনও উত্তাপই বোধ করতাম না। এম পি প্রোডাকশনস্এর *সাড়ে চুয়াত্তর* ছবিতে সুচিত্রা সেন নামে এক নায়িকার সঙ্গে অভিনয় করতে গিয়ে বুঝতে পারলাম, আমার নায়িকা এসে গিয়েছে।'

এসব প্রমাণ করে দু'জনের সম্পর্কের টানাপোড়েন, সুচিত্রার অবচেতনায় উত্তমকে অধস্তন করে রাখার মানসিকতা, অন্যদিকে উত্তমের, না, ঠিক নতি বলব না একে, বিনতি। অথচ সাংবাদিকের নজর এড়ায় না যখন সুচিত্রা ফোনে উত্তমকে চুমু খান, একমাত্র তাঁরাই পরস্পরকে 'তুই' সম্বোধন করেন, আর উত্তমের চুয়ান্ন বছর বয়সে মৃত্যুতে ফুল দিতে এসে কান্নাভেজা গলায় সুচিত্রার উক্তি আর আক্ষেপ এই মর্মকথাই ব্যক্ত করে, এরা দু'জন পরস্পরের কী না হতে পারতেন (বা হয়েছিলেনই হয়তো!) উত্তমসুচি ত্রা যা, বাস্তব জীবনেও ভ্রম হত, এবং তাদের ভ্রমকে তাঁদের দর্শকরা জিইয়েও রাখতে চাইত, যে এঁরা স্বামী-স্ত্রী।

দু'জনের সম্পর্কের শৈথিল্যের প্রামাণ্যতা দেখানোর জন্য বলি, উভয়ের দ্বৈত অভিনয়ের তিরিশটি ছবির মধ্যে ১৯৫৩ থেকে '৬০এর মধ্যে যেখানে তৈরি হয়েছিল বাইশটি ছবি, পরবর্তী কুড়ি বছরে অর্থাৎ উত্তমকুমার প্রয়াত হলেন যেবার, সেই ১৯৮০র সালতামামি অনুযায়ী তাঁদের যৌথ অভিনয়ের ছবি মাত্র আট। প্রযোজকপরিচালকরা তো আরো বেশি মনোযোগী হবেন তাঁদের নিয়ে ছবি করতে,

বিশেষ করে দুজনেরই জনপ্রিয়তা বাড়ছিল যেমন, তেমনি অভিনয়দক্ষতায় বারবারই নিজেদের অতিক্রম করছিলেন এঁরা। দু'জনের সম্পর্কে চিড় ধরেছিল, ইগোর সমস্যা ছিল সুচিত্রার, কেউ কেউ এমত বলেন।

সুচিত্রার আগে নায়িকাদের ইতিহাস তো তাঁদের প্রতি তঞ্চকতা, বিশ্বাসহানি আর শোষণের ইতিহাস। সিনেমা, নাটকের পেছনে মেয়েদের আত্মত্যাগের মহিমা উজ্জ্বল হয়ে আছে বিনোদিনীর জীবনীপাঠে। আর্থিক শোষণ তো ছিলই, ছিল মানসিক এবং এমনকি শারীরিক হেনস্তার দীর্ঘ অরুন্তুদ ইতিবৃত্ত। ছবিতে, নাটকে পুরুষপ্রাধান্য থাকবে, এটা স্বতঃসিদ্ধ ছিল। সুচিত্রা এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ। মাধবী মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা চট্টোপাধ্যায়রা সুচিত্রার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে এই দিকটির কথা উলেখ করে বলেছেন, 'বাংলা চলচ্চিত্রে আর্থিক কৌলীন্যের ধারাবাহিকতা নিয়ে এলেন তিনি।' আর পুরুষ সর্বস্বতার বিরুদ্ধে দ্রোহ। তাঁর অভিনয়শৈলী, দেশে-বিদেশে নানা পুরস্কার লাভ, এসবের তো যথার্থ মূল্যায়ন অপেক্ষিত হয়ে রইলই। এর বাইরে এই যে একক নারীবাদের লড়াই, যার ফল ভোগ করছে আজকের নারীপ্রজন্ম, তাঁকে যথাযথ মর্যাদা না দিলে বাংলা চলচ্চিত্র সুচিত্রার কাছে অপরাধী হয়ে থাকবে।

উত্তমকুমার যখন ব্যক্তি উত্তমকুমার, তখন তিনি তাঁর সুহৃদ, অন্তরঙ্গ, এমনকি বন্ধু। বন্ধু শব্দটি এখানে তাৎপর্যপূর্ণ মাত্রায় ব্যবহার করা হল। শাস্ত্রে বলে, যার ত্যাগ, বিচ্ছেদ, সহ্য করা যায় না, তাকে বলে বন্ধু, 'অত্যাগসহনো বন্ধু'। অন্যদিকে উত্তমকুমার যখন একটি প্রতিষ্ঠান, সামন্ততন্ত্রের প্রশ্রয়িত পুরুষ, তখন তাঁর বিরুদ্ধে সুচিত্রার লড়াই। এই লড়াই জারি থাকা সত্ত্বেও উত্তম যখন সুচিত্রার জেদের কাছে নত হন, তাতে উত্তমের মহানুভবতা যেমন প্রমাণিত হয়, ঠিক তেমনি 'সুচিত্রা ছাড়া আমি উত্তম হতে পারতাম না' উত্তমের এহেন বিনয়ী সুবাক্য পাঠ করে তার চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে সুচিত্রার, সে সংলাপ বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে ধার করে আমাদের উচ্চারণ করতে হবে, আশেষা যা ওসমান সম্পর্কে বলেছিল, 'এ বন্দী আমার প্রাণেশ্বর।' এ বন্দিত্ব কল্পনীয়, ব্যাখ্যেয় নয়।

থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার সুচিত্রা সেন...

সুচিত্রার মৃত্যুর পর সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে মুনমুন সেন বলছেন, 'সত্যিই মা আমাকে 'একা' করে দিয়ে গেলেন, একেবারে একা।' শাস্ত্রবিধি মেনে চার দিনের দিন শ্রাদ্ধকাজ সম্পন্ন করেছেন মুনমুন, বাড়িতে স্মরণসভার আয়োজনও করেছেন, মায়ের অস্থি বিসর্জন দিয়ে এসেছেন বারানসী গিয়ে। হ্যাঁ, তারপর তো এক নিঃসীম শূন্যতা অথচ তাঁর মৃত্যুতে এপার যেমন ওপার বাংলাও, না, শোকস্তব্ধ নয়, শোকমুখর। বাংলাদেশের রাজ্জাক আর এদেশের রঞ্জিত মলিক, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও ববিতা, শংকরলাল ভট্টাচার্য আর নির্মলেন্দু গুণ তাঁকে নিয়ে অক্ষরের বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। দুই বাংলার মানুষ অশ্রুবেদনাসিক্ত আর্তির পরিপূরক হিসেবে দেখে নিচ্ছে সুচিত্রা অভিনীত চলচ্চিত্র, দুই বাংলার টিভি চ্যানেলগুলোর দৌলদে;ত। মুখে মুখে গুঞ্জরিত হচ্ছে সুচিত্রার অধরে ধৃত বিভিন্ন শিল্পীর গান: 'কানে কানে শুধু একবার বল, তুমি যে আমার'ই হোক বা 'এই পথ যদি না শেষ হয়', অথবা 'কিছুক্ষণ আরো না হয় রহিতে কাছে...'। সৌমিত্র জানাচ্ছেন, সত্যজিৎ-মৃণালের বহু ছবির অবধারিত নায়ক সৌমিত্র, 'সুচিত্রা সেনের সৌন্দর্যের এমন একটি প্রভা ছিল, ক্যামেরার সামনে এমন একটি লাবণ্য ছিল যে, তাঁর সঙ্গে একই পর্দায় আসা বড় একটি ঘটনা ছিল নিঃসন্দেহে।' ঢাকা থেকে প্রকাশিত The Daily Star সুচিত্রার মৃত্যু সংবাদ ছাপে এরকম শিরোনাম দিয়ে, 'Departure of a queen of million hearts', অন্যদিকে *আনন্দবাজার পত্রিকা* স্তব্ধতার নিরাবরণে বয়ন করে সংবাদ, মৃত্যুর কথা না লিখে সে পত্রিকায় কেবল লেখা হয়, সুচিত্রা সেন ১৯৩১২০১৪। পত্রিকায় পত্রিকায় তাঁর সম্পর্কে নতুন নতুন তথ্য। পূর্ণেন্দু পত্রী লিখছেন, কীভাবে *চতুরঙ্গকে* চলচ্চিত্রয়িত করার সূত্রে পূর্ণেন্দু পত্রী সুচিত্রার বাড়ির নিয়তপরিবর্তনশীল রূপপরিবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিজেও অনুসরণকারী হয়ে ওঠেন সুচিত্রার। অন্যদিকে সুচিত্রা যে পাঁচের দশকে অন্তত একবার বেতারনাটকে অভিনয় করেছিলেন বসন্ত চৌধুরীর সঙ্গে শ্রীচৈতন্যকে নিয়ে লেখা নাটকে, বিষ্ণুপ্রিয়ার ভূমিকায়, জানা যায় এ তথ্যও। নিঃসন্দেহে একটি অজানা তথ্য এটি।

এই সব দুরূহ তথ্যের পাশে রাখা যাক অন্য একটি বিবেচনাযোগ্য প্রসঙ্গকে। ১৯৫৫-তে যখন *দেবদাস* মুক্তি পায়, সুচিত্রা তাঁর তিন বছরের অভিনেত্রী জীবনে এতটাই সমীহ আদায় করে নিতে পেরেছিলেন যে ছবিটি মুক্তির পূর্বে *দেশ* পত্রিকা, যেটি মূলত সাহিত্যপত্রিকা, অন্তত পাঁচবার ছবি ছেপেছে সুচিত্রার, পার্বতীরূপিণী নায়িকার। পত্রিকাটির ইতিহাসে এই ঘটনা দ্বিতীয়রহিত।

শুটিং শেষ হতে না হতেই ঘরে ফিরে যাওয়ার উদ্‌গ্রীব উৎকণ্ঠা থেকে নাকি সুচিত্রা বারবার বলতেন, 'আমি বাড়ি যাব, আমি বাড়ি যাব'। মেয়েকে একাকী রেখে কোন বাড়িতে ফিরলেন মা?

মলয়চন্দন মুখোপাধ্যায়
ভারতের কবি, কথাকার

শ্রদ্ধাঞ্জলি

দূরের নক্ষত্র

সৈয়দ হাসমত জালাল

কোনও কৃতী, বড় মাপের স্রষ্টা বা সমাজজীবনে খুব জনপ্রিয় ব্যক্তির মৃত্যু হলে জনমানসে এক ধরনের গভীর আন্দোলন ওঠে। বারবার এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি আমরা। সে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা উত্তমকুমারের ক্ষেত্রে হোক অথবা তিনি জ্যোতি বসু বা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় হতে পারেন। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশেও কি এমন ঘটনা ঘটেনি হুমায়ূন আহমেদের মৃত্যুর পর! সেই একই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি আমরা দেখলাম সুচিত্রা সেনের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে। মৃত্যুর আগে সুচিত্রা সেন বেশ কয়েকদিন ধরেই অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তখন থেকেই গণমাধ্যমগুলিতে অবিরাম ছড়িয়ে পড়েছে এই আন্দোলিত, আলোড়িত জনমানসের উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা এবং সেইসঙ্গে তাঁর আরোগ্য কামনার বার্তা। সুচিত্রা সেনের মত একজন জীবন্ত কিংবদন্তির ক্ষেত্রে এটাই তো খুব স্বাভাবিক। সুচিত্রা সেন মানেই তো চিরযৌবনা, এক আশ্চর্য অধরা মাধুরী, বিগত শতকের পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর দশকের কয়েক কোটি বাঙালির হৃৎস্পন্দন, যাঁর বার্ধক্য নেই, জরা নেই, যিনি বাঙালির চিরকালীন প্রেমের, স্বপ্নের এক মায়াবী প্রতিমা। তাই তাঁর প্রয়াণে বাঙালিহৃদয়ে যুক্তির চেয়ে আবেগের প্রাবল্যই সক্রিয় হয়ে উঠবে, এটাও স্বাভাবিক। সেজন্যই বোধহয় একজন প্রবীণ চলচ্চিত্রনায়ককে বলতে শুনি, সুচিত্রা সেনের মৃত্যুতে বাংলা সিনেমার অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল!

সদ্য প্রয়াত কোনও ব্যক্তির সম্পর্কে অপ্রিয় কথা না বলাই ভদ্রসমাজের রীতি। কিন্তু কথাটি কি আমরা ভেবে দেখব না যে, ১৭ জানুয়ারি সুচিত্রা সেনের জীবনাবসানে কি সত্যিই বাংলার সিনেমার অপূরণীয় ক্ষতি হল! এই উক্তির মধ্যে লক্ষ লক্ষ সুচিত্রাঅনুরাগী এবং বাংলা সি নেমা অনুরাগীদেরও আবেগের প্রতিফলন হয়তো ঘটেছে। কিন্তু আমরা কি একটু যুক্তি দিয়ে ভেবে দেখব না যে, সুচিত্রার অবর্তমানে বাংলার সিনেমার যদি কিছু বা যা কিছু ক্ষতি ঘটে থাকে কিংবা ঘটেছে, তা তো ঘটেছে চৌত্রিশ বছর আগেই, সেই ১৯৭৮ সালে, যখন তিনি তাঁর শেষ ছবি *প্রণয়পাশার* পর অভিনয়জগত থেকে সম্পূর্ণভাবে চলে গেলেন স্বেচ্ছানির্বাসনে।

পঁচিশ বছর ধরে যিনি প্রায় সম্রাজ্ঞীর মত বিচরণ করেছিলেন পুরুষশাসিত সিনেমাশিল্পের জগতে, হয়ে উঠছিলেন লক্ষ লক্ষ যুবক্ষ যুবতীর স্বপ্ন ও কামনার প্রতিমূর্তি, তিনি কেন মাত্র সাতচল্লিশ বছর বয়সেই এই মোহ্লআবরণ ছুঁ ড়ে ফেলে চলে গেলেন একান্ত ব্যক্তিগত জীবনের দুর্ভেদ্য অন্তরালে, তা বোধহয় চিরকালই রহস্যাবৃত থেকে যাবে। আসলে মানুষের মন বড় দুর্জ্ঞেয়।

একশ্রেণির সিনেম্লাসমা লোচকরা মনে করেন, সুচিত্রা সেনের শেষদিকের কয়েকটি ছবি, যেমন, *শ্রাবণসন্ধ্যা, প্রিয় বান্ধবী, প্রণয়পাশা* ইত্যাদি সেভাবে বাণিজ্যিক সফলতা পায়নি। তাতে কি অত্যন্ত সংবেদনশীল, আত্মসচেতন সুচিত্রা একটু থমকে গিয়েছিলেন! বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর স্বপ্নসম্ভব যৌবনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী রোমান্টিক ভাবমূর্তিতে এবার আঁচড় কাটতে উদ্যত হয়েছে অমোঘ, অপ্রতিরোধ্য সময়! বয়স কি ছায়া ফেলতে শুরু করেছে ওই অপরূপ রূপাগ্নির উজ্জ্বলতায়! শোনা যায়, এক তরুণ প্রযোজক তাঁর সঙ্গে নতুন ছবির চুক্তি করতে এসে শুনিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর শেষ ছবিগুলির বাণিজ্যিক ক্ষতির কথা। পঁচিশ বছর ধরে বাংলা সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিকে শাসন করে আসছেন যিনি, সেই 'ম্যাডাম্'এর মু খের উপর এমন কথা বরদাস্ত করতে পারেননি তিনি। এরপর চিরকালের জন্য তিনি প্রযোজক আর পরিচালকদের জন্য বন্ধ করে দিয়েছিলেন তাঁর দরজা।

আবার এরকম অভিমতও তো স্পষ্ট যে, তিনি অত্যন্ত সচেতনভাবেই চেয়েছিলেন তাঁর ওই অরূপ্লমাধুর্য মণ্ডিত রোমান্টিক মায়ামুখচ্ছবিখানিই চিরদিনের জন্য অটুট থাকুক বাঙালির হৃদয়ে। পুরন্নষের সমকক্ষ হয়ে ওঠার ওই পেলব স্পর্ধা, অননুকরণীয় গ্রীবাভঙ্গিমা, দৃষ্টির মায়াবী লাবণ্য, ওষ্ঠতটে আছড়ে পড়া চাপা অভিমান কিংবা হাসির বিচ্ছুরণ– এমনই চিরকাল আলোড়িত করুক বঙ্গসমাজের স্মৃতিকে, এমনটাই কি তিনি চেয়েছিলেন! নিজের আদর্শে অবিচল থেকেও, আত্মমর্যাদা বজায় রেখেও, শেষ পর্যন্ত ভালবাসার কাছে নিবিড় আত্মসমর্পণ– বাঙালি নারীর এই তেজস্বিতা, এই প্রেম বাঙালি পুরুষের যে চির আকাঙ্ক্ষার ধন– সেই কামনাবাসনার মায়ামূর্তিটি হয়েই তিনি বেঁচে থাকতে চেয়েছেন অনন্তকাল!

এ কি নিছক শিল্পীমনের খেয়াল! নাকি এও একধর নের 'নার্সিসিজম', প্রশ্ন তুলেছেন সমালোচকরা। কিন্তু নিজের সিদ্ধান্তে সুচিত্রা সেন এতটাই অবিচল ছিলেন যে সর্বসমক্ষে গ্রহণ করবেন না বলে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন *দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার*। এই পুরস্কার তো এদেশের সিনেমা ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান। এই নিয়ে তাই ভিন্ন মতও শোনা যায়। সত্তর দশকের শুরু থেকেই তিনি ক্রমশ সরে যাচ্ছিলেন আধ্যাত্মিকতার দিকে। ১৯৭৩ সালে তিনি দীক্ষাও গ্রহণ করেন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে। তিনি লোকচক্ষুর আড়ালে, কালো কাচের জানলা তোলা গাড়িতে, ভোরবেলা বা মধ্যরাতে চলে যেতেন বেলুড় মঠের স্বামী অভয়ানন্দের কাছে। স্বামী অভয়ানন্দ, যিনি ভরত মহারাজ নামেও পরিচিত ছিলেন, ১৯৭৮ সালে সুচিত্রা সেনের কোনও এক গভীর হতাশায় মুহূর্তে তাঁকে সব কিছু ত্যাগ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। আর তাই তিনি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছিলেন চিত্রতারকার মোহময় জীবন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও মা সারদার প্রতি ভক্তি তাঁর জীবনে যোগ করেছিল অন্যতর তাৎপর্য।

কারণ য্যাই হোক না কেন, তাঁর এই স্বেচ্ছানির্বাসন যে বাংলা সিনেমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল, সুচিত্রা সম্পর্কে এরকম ভাবনাকে কি অস্বীকার করা যায়! সুচিত্রা সেনের সাফল্যের সিংহভাগ জড়িয়ে আছে যে উত্তমকুমারের সঙ্গে রূপালি পর্দায় তাঁর রহস্যময় রসায়নে, সেই উত্তমকুমার অমোঘ সময়শাসন মেনে নিয়ে রোমান্টিক নায়কের ভূমিকা থেকে সরে এসে তাৎপর্যপূর্ণ এক্কএকটি চরি ত্রাভিনয়ের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন এবং সফলও হলেন। এভাবেই তিনি নিজের ভাবমূর্তি ভেঙে ক্রমশ প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন তাঁর অভিনয়প্রতিভাকে। আরও কিছুদিন বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই আরও কিছু অবিস্মরণীয় চরিত্র তিনি নির্মাণ করে যেতে পারতেন। সুচিত্রা সেনও যে তা পারতেন, তার প্রমাণ তিনি দিয়ে গেছেন *ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য* ছবির বিষ্ণুপ্রিয়া, *হাসপাতাল্ল* এর শর্বরী বা *উত্তরফাল্গুনীর* পান্নাবাল্লিএর মত চরি ত্রগুলিতে। তাহলে উত্তম্লসুচি ত্রা জুটির প্রায় নির্দিষ্ট কিছু ফর্মুলায় তৈরি ছবির সাফল্যের মধ্যে তিনি সীমাবদ্ধ থেকে গেলেন কেন? উত্তমকুমার ছাড়া অন্যান্য নায়কের সঙ্গে তাঁর অভিনীত ছবিগুলির কথা মাথায় রেখেই এ কথা বলছি। *সাত পাকে বাঁধা* ছবিটির কথাও ভুলছি না, যা তাঁকে মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার এনে দিয়েছিল।

তবুও উত্তম্লসুচি ত্রা জুটির নিয়তি কি নির্ধারিত হয়েছিল তাঁদের

অভিনীত ছবিগুলির নিশ্চিত বাণিজ্যিক সাফল্যে? প্রযোজকপরিচালকরা এই ফর্মুলার বাইরে বেরোনোর ঝুঁকি নেননি শুধুমাত্র বাণিজ্যিক কারণেই! অন্যদিকে সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন বা তপন সিংহের মত পরিচালকদের ছবিতেও সুচিত্রা সেনকে দেখার সুযোগ ঘটেনি দর্শকদের। এ তো বাংলা সিনেমার পক্ষে এক ধরনের ক্ষতিই! কিন্তু সে ক্ষতি নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায়নি পঞ্চাশ বা ষাট দশকের বঙ্গসমাজ। কেন ঘামায়নি, তার উত্তর লুকিয়ে আছে ১৯৪৭এর দেশভাগপরবর্তী সময়কালের মধ্যে। দেশভাগের ফলে এবঙ্গে ক্রমশই আসতে থেকেছে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু মানুষ, শুরু হয়েছে তাঁদের বেঁচে থাকার লড়াই। এপারের বাঙালিও হারিয়ে ফেলেছিল তাদের আত্মপরিচয়। সব মিলিয়ে সময়টা ছিল বাঙালির আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই সংগ্রামের যুগ। সে সময় উত্তমসুচি ত্রার *শাপমোচন* কিংবা *হারানো সুর* বস্তুত বাঙালি এই টালমাটাল জীবনে এনে দিয়েছিল এক ঝলক স্বপ্ন ও প্রণয়ের আশ্বাস। বাস্তবের সঙ্গে মিশে যায় কল্পনা, স্বপ্নের সঙ্গে ইচ্ছাপূরণের মায়া। এই লড়াই, এই দ্বন্দ্ব, এই প্রেম, এই বিরহ, এই মিলন যা রেখে যায় বিবাহ বা দাম্পত্যের নিশ্চিত আশ্বাস– এরকম কল্পিত বিশ্বাসের জগতে পঞ্চাশ্লষাট দশ কের বাঙালিদের একাত্মতা বোধ না করে উপায় ছিল না।

সুচিত্রা সেনের তেজস্বিতা, নিজস্ব আদর্শের জন্য অভিভাবকদের প্রতি সংযত বিদ্রোহ কিংবা প্রেমের জন্য রাধাসুলভ বিরহবিধুরতার মধ্যে তখনকার বাঙালি নারীও খুঁজে পেত তার গোপন স্বপ্নবাসনার পরিপূর্ণতা। অন্যদিকে তেজোদীপ্ত, অহংকারী, আবার প্রিয় পুরন্নষটির প্রেরণাদাত্রী, অভিমানী– সুচিত্রা সেনের অভিনীত এই ধরনের নারীচরিত্রের প্রতি বাঙালির অপরিসীম দুর্বলতা। এই নারীই তো তার কাম্য। কারণ এই নারীর বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত পুরুষের ছায়ায় আশ্রয় নেয়, তা পিতৃতান্ত্রিক পরিবারকে বা সমাজকে বিপন্ন করে না। এই ধরনের চরিত্রে সুচিত্রা সেন ছিলেন অতুলনীয়া। এখানে যেমন তাঁর অসাধারণ সাফল্য, তেমনি এখানেই বোধহয় রয়ে গেছে তাঁর সীমাবদ্ধতাও।

এ কথা অনস্বীকার্য, সুচিত্রা সেন নিজেই বাংলা সিনেমার একটি অধ্যায়, একটি যুগ এবং স্লেযুগ পরিণতি পেয়েছে সুচিত্রা সেনের মধ্যেই। কানন দেবীপরবর্তী সময়ে বাংলা সিনেমার প্রয়োজন ছিল একজন সুচিত্রা সেনের মত নায়িকার, যিনি নড়বড়ে বাংলা সিনেমা ইন্ডাস্ট্রিকে দাঁড় করিয়ে দিতে পারবেন তাঁর গ্লামার ও অভিনয়ের মিশ্রণে। সুচিত্রা তা দিয়েছেনও। বহু দুর্বল চিত্রনাট্যকে তিনি শেষ পর্যন্ত উতরে দিয়েছেন, এমনকি এনে দিয়েছেন বাণিজ্যিক সাফল্যও। তাঁর তিপ্পান্নটি বাংলা ছবি এবং সাতটি হিন্দি ছবির মধ্যে সব মিলিয়ে প্রায় পঞ্চাশটি ছবি বাণিজ্যিক সাফল্য পেয়েছে। এই খতিয়ান নিঃসন্দেহে শস্নাঘার বিষয়। বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের মধ্যে তেমন না হলেও, মধ্যবয়স্ক বা পঞ্চাশোর্ধ লক্ষ লক্ষ বাঙালির কাছে সুচিত্রা সেন আজও জনপ্রিয়তার শীর্ষে।

কিন্তু তবুও অনেকের কাছেই এটা পরিতাপের বিষয় যে, নিরাপদ ফর্মুল্লাছবির ম ধ্যেই থেকে গেলেন তিনি। নিজের অভিনয়কুশলতাকে প্রসারিত করার প্রয়াস দেখা গেল না তাঁর মধ্যে। হতে পারে, পুরুষশাসিত ইন্ডাস্ট্রিতে তিনি নিজের শর্তে কাজ করে গেছেন, একজন নারীশিল্পীর আত্মমর্যাদাকে তিনি প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন, আর তাই করতে গিয়ে কি তিনি শুধুই গ্ল্যামারের পথটিকে বেছে নিলেন? শিল্পের প্রতি রয়ে গেলেন উদাসীন! প্রকৃত শিল্পীর মত নিজেকেই বার বার অতিক্রম করার পথে পা বাড়ালেন না!

নিজের সৌন্দর্যের মায়াজাল ছিঁড়ে বেরোলেন না বলে তিনি শেষ পর্যন্ত দূরের নক্ষত্র হয়েই থেকে গেলেন। থেকে গেলেন এক আশ্চর্য মায়াকাননের ফুল হয়ে, দূরতর দ্বীপ হয়ে। তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছে অনিচ্ছের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেও তাই কিছুটা দুঃখও থেকে যায় চলচ্চিত্রশিল্পঅনুরাগী দের মনে।

সৈয়দ হাসমত জালাল
ভারতের সাংবাদিক

শ্রদ্ধাঞ্জলি

প্রিয়তমা সুন্দরীতমা

আসাদ চৌধুরী

প্রিয়তমা সুন্দরীতমারে, যে আমার উজ্জ্বল উদ্ধার। বোদলেয়ার আর বুদ্ধদেব বসুর কাছে ক্ষমা চেয়ে সামান্য দু'টি শব্দ পাল্টাই, 'যে আমার' পাল্টে 'যিনি আমাদের' বলতে চাই, যিনি কেন না, এমন বিচ্ছুরিত সৌন্দর্য আমি আগে কখনো দেখিনি, যদিও আমি দেখিনি, তবু, বিনয়ের বহুবচন নয়, ভাল করেই জানি, তিনি লক্ষ-কোটি অনুরাগীর দৃষ্টিকে ভ্রান্ত করতেন। আর কী অসাধারণ ধারণা নিজের সম্পর্কে সেই রূপৈশ্বর্য তিনি দেবীদের মতই অনন্ত যৌবনা তাই দৃষ্টির আড়ালে গিয়েই টিকিয়ে রাখলেন। ইনি যে সুচিত্রা সেনই, তাও যদি আমার মুখ ফুটে বলতে হয়, তার চেয়ে দুঃখের কী হতে পারে!

উপমহাদেশের সবচেয়ে টালমাটাল সময়ে তিনি দেশ ছেড়েছিলেন, তারপরই তো প্রবাসজীবন। শুনেছি, তাঁর নাকি ইচ্ছা ছিল, তার দেহ নিজদেশে ফিরিয়ে আনার। শুনে ভাল লেগেছিল, শুনেছি পাবনার দিলালপুরে ধোয়া-মোছাও শুরু হয়েছিল।

মেয়েদের সৌন্দর্যে শুনেছি দেবতারাও কাবু হন, মুনি-ঋষিরা পর্যন্ত টলেন, আমরা তো অতি নগণ্য মানুষ। আসলে, তাঁর সৌন্দর্য তাঁর ব্যক্তিত্বে, যে কাজ তিনি করতেন– অভিনয়– সেখানে তাঁর পারঙ্গমতা, দক্ষতা, মেধা ও শ্রমদান– সে তো বিশ্বস্বীকৃত। তাঁর চোখ কথা বলতে জানত, তাঁর চুল কথা বলতে জানত, তাঁর উপস্থিতি, মুভির পর্দা ছাড়া আবার কোথায়, অন্তত আমাদের জন্য, যারা সরাসরি চোখে দেখিনি, আলো সঞ্চার করত। প্রথম ছবির অভিজ্ঞতা বলি। সরদঘাটের *রূপমহল* প্রেক্ষাগৃহে *অগ্নিপরীক্ষা* রিলিজ হয়েছে। শিখারানী বাগ তাঁর শৈশবের অংশটুকু করেছেন, সেই অংশটুকু পেরিয়ে গেলেই হই হই করে কিছু দর্শক প্রেক্ষাগৃহে ঢুকতেন। চা-লস্যি যাঁরা বিক্রি করতেন, তাঁরা কালো পর্দা থেকে বেরিয়ে চিৎকার করে বলতেন, 'সুচিত্রা সেন আইছে, আইয়া পড়েন।' ঢাকার দর্শক *অগ্নিপরীক্ষা* কতবার যে দেখেছেন তার ইয়ত্তা নেই। আরেকটা ছবি, *বাহার*, সে তো বৈজয়ন্তীমালার জন্যই, নৃত্যের জন্যই সম্ভবত। পঞ্চাশের মাঝামাঝি সময়ে, দুর্গাপূজার সময়ে, শাঁখারীপট্টিতে পূজাম-পের তোরণের দু'পাশে দেবদেবীর রঙিন ছবি, দু'পাশে সবার নীচে সাদা-কালো সুচিত্রা সেনের ফটো– নিজের চোখকে কী করে

অস্বীকার করি? যদিও তিনি আমার অসম্ভব প্রিয়, তাঁর অগণিত অসংখ্য ভক্তদের কথা ভেবেই তো শব্দ পাল্টালাম।

তাঁর আগে ছিলেন কানন দেবী, আমার আম্মা বলতেন কাননবালা, তিনি বায়োস্কোপ থেকে এই শিল্পকে সিনেমায় এনেছিলেন, আমরা যারা এলিজাবেথ টেলর, সোফিয়া লরেনদের ভক্ত– সুচিত্রা সেন, অবশ্যই উত্তম-সুচিত্রা (সাংবাদিকরা জানালেন শেষের দিকে ছবির পোস্টারে নাকি সুচিত্রা-উত্তম ব্যবহৃত হত– তারা কি ভুল তথ্য দেবেন?) আর সত্যজিৎ-ঋত্বিক ঘটক– মুভিতে দাঁড় করালেন।

তাঁর পরিচয় তিনি অভিনেত্রী, তিনি নায়িকা– সম্ভ্রান্ত, অভিজাত, মর্যাদাসম্পন্ন– এরকম শব্দ যেন তাঁরই জন্য অপেক্ষা করছিল। একটিমাত্র ছায়াছবিতে, *ফরিয়াদ* (১৯৭১ সালে কলকাতায় দেখেছিলাম) ছবিতে তিনি হেলেন-মার্কা, কাক্কু-মার্কা নেত্য করেছিলেন, সম্ভবত আশা ভোঁশলের গাওয়া 'আজ দু'জনে মন্দ হলে মন্দ কী' এই গানটির সঙ্গে। চাপে পড়ে, নির্যাতিতা নারীর ভূমিকায়, নির্যাতক আর কে হবেন, উৎপল দত্তের মত অসাধারণ নট ছাড়া? বাংলা-হিন্দি সব মিলিয়ে ৬১টি ছবিতে অভিনয় করেছেন দর্শকদের হৃদয়হরণের জন্য সুচিত্রা সেন। এমন জনপ্রিয় শিল্পীর সঙ্গে একমাত্র তুলনীয় কানন দেবী। কানন দেবীর আত্মজীবনী, *সবারে আমি নমি*, বৈষ্ণব-বিনয়ের জন্য চেপে-চুপে লিখলেও বাকি থাকে না, তাঁর কী ধরনের পাগলা ভক্ত ছিল। আমি ভক্তই লিখলাম, ফ্যান লিখতে আমার প্রাণের সায় নেই বলে, আমি এবং আমার সন্তানেরা তাঁর গানের অসম্ভব ভক্ত, জানিয়ে রাখা ভাল।

সুচিত্রা সেন সম্পর্কে তাঁর প্রয়াণের পরপরই ঢাকার প্রতিটি টিভি চ্যানেলে ইউটিউব থেকে ক্লিপিং যোগাড় করে পর পর কয়েকদিন অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়েছে। একটি চ্যানেলে আমি উপস্থাপকের দায়িত্ব পালন করেছিলাম। ফেরদৌসী রহমানের মত শিল্পী জানালেন, সুচিত্রা সেন গান না জানলে এত ভাল ঠোঁট মেলাতে কিছুতেই পারতেন না। বুঝুন!

অনেকের জানা, তবু তাঁর জীবনপঞ্জি 'এক ঝলক' দেখা যাক–

১৯৩১
৬ এপ্রিল সেনহাটির জমিদারকুলের মাতুলালয়ে তাঁর জন্ম। বড় হয়ে ওঠা পাবনার দিলালপুরে। পিতৃদত্ত নাম রমা দাশগুপ্ত। বাবার আদরের কৃষ্ণা।

১৯৪৭
বিশিষ্ট শিল্পপতি আদিনাথ সেনের ছেলে দিবানাথ সেনের সঙ্গে বিয়ে। দাদাশ্বশুর দীননাথ সেন জঙ্গল কেটে ঢাকার গেন্ডারিয়া অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন।

১৯৪৮
মেয়ে মুনমুন সেনের জন্ম।

১৯৫২
বাংলা সিনেমায় আত্মপ্রকাশ। প্রথম ছবি *শেষ কোথায়* মুক্তি পায়নি।

১৯৫৩
মুক্তিপ্রাপ্ত প্রথম ছবি *সাত নম্বর কয়েদী*। সে বছরই উত্তমকুমারের সঙ্গে জুটি বেঁধে ছবি *সাড়ে চুয়াত্তর* সাড়া জাগায়।

১৯৬২
১০বছরে ২৫টি সিনেমা করার পর উত্তমকুমারের সঙ্গে জুটি ভঙ্গ। পরবর্তী ১৬ বছরের অভিনয়জীবনে উত্তমকুমারের সঙ্গে অভিনয় করেন মাত্র ৫টি ছবিতে।

১৯৬৩
মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে *সপ্তপদী*র জন্য সেরা অভিনেত্রীর সম্মান লাভ।

১৯৬৭
ফিল্মফেয়ার সেরা অভিনেত্রীর সম্মান অর্জন *মমতা* (হিন্দি) ছবির জন্য।

১৯৬৯
২৮ নভেম্বর স্বামী দিবানাথ সেনের মৃত্যু।

১৯৭২
পদ্মশ্রী খেতাব লাভ।

১৯৭৮
শেষ ছবি *প্রণয়পাশা* সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের বিপরীতে। দীর্ঘ ২৬ বছরের অভিনয় জীবনে ৬১টি ছবিতে অভিনয় করেন। ৩১টি উত্তমকুমারের সঙ্গে। বাকি ৩০টিতে অভিনয় করেছেন ১৫জন নায়কের সঙ্গে। সিদ্ধান্ত নেন আর জনসমক্ষে আসবেন না।

১৯৮০
নিয়ম ভাঙলেন। ২৪ জুলাই উত্তমকুমারের মৃত্যু বেলভিউ হাসপাতলে। মধ্যরাতে হরিশ মুখার্জি রোডের উত্তমকুমারের বাড়ি গেলেন সান গ্লাস চোখে। একান্তে শেষ শ্রদ্ধা প্রিয় বন্ধুকে।

১৯৮৭
নির্বাচন কমিশনের সচিত্র পরিচয়পত্রের ছবি তোলাতে সবার সঙ্গে লাইনে দাঁড়ালেন। সেই শেষ সবার সামনে আসা।

২০০৫
জনতার সামনে আসবেন না। তাই *দাদা সাহেব ফালকে সম্মান* পেয়েও প্রত্যাখ্যান।

২০১২
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের *বঙ্গবিভূষণ* সম্মান গ্রহণ। অভিনেত্রী মুনমুন সেন মায়ের হয়ে সম্মাননা গ্রহণ করেন।

২০১৩
২৪ ডিসেম্বর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন।

২০১৪
১৭ জানুয়ারি শুক্রবার স্থানীয় সময় সকাল ৮টা ২৫ মিনিটে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে কলকাতার বেলভিউ হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

আমি *সাড়ে চুয়াত্তর* ছবিটি দেখেছি। আমার ভীষণ ভাল লেগেছিল তুলসী লাহিড়ির অভিনয়। সত্যজিৎ রায়ের মত পরিচালক যে তাঁকে মর্যাদা দিয়েছিলেন এজন্য আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। তবে সেই ছবিতেই বাংলা ছায়াছবির ভবিষ্যৎ বোঝা যাচ্ছিল। এর আগে যতটা মনে পড়ে উত্তমকুমার অভিনীত *বসু পরিবার* দেখে এক মহানায়ককে চিনতে আমাদের ভুল হয়নি। *শেষ কোথায়* অসমাপ্ত ছায়াছবিটি যেহেতু মুক্তি পায়নি, আর *সাত নম্বর কয়েদী* ছায়াছবিটি দেখিনি, তাই *সাড়ে চুয়াত্তর*ই দিয়েই এক অর্থে যাত্রা শুরু, যদিও, টিভি স্ক্রিনে দেখতে হয়েছিল। আমার দেখা এ পর্যন্ত তাঁর সর্বশেষ ছায়াছবি সলিল সেন পরিচালিত *হার মানা হার*। এই ছবিটিও ভারতীয় বাংলা চ্যানেলে দেখেছি কিছু দিন আগে, বেশ আগের ছবি, এরকম ব্যক্তিত্ব এর আগে বাংলা কেন উপমহাদেশের কোন ছায়াছবিতেই দেখিনি। কী প্রচণ্ড আত্মসম্মানবোধ, দায়িত্বপালনে কী নিষ্ঠা ও সততা, নির্ভীক ও সাহসী– না, গল্পটা তেমন যুৎসই ছিল না, কিন্তু যাঁকে মনে রাখতে হয়, তিনি অবশ্যই সুচিত্রা সেন, অপরজন উত্তমকুমার।

সুচিত্রা সেন অবশ্যই আমার মুগ্ধতাকে কেড়ে নিয়েছিলেন। তাই বিচারে-বিশ্লেষণে আমি উৎসাহী হইনি। রূপ বিচারে বিশেষ করে মেয়েদের ব্যাপারে, আমার মনে হয় দু'ধরনের বোধ কাজ করে। পশ্চিমের সুন্দরী ধারণাটা গ্রিক দেবীদের প্রভাবেই কী না জানিনে, আমার কাছে এক রকম, আর উপমহাদেশের ক্ষেত্রে অন্যরকম। কানন দেবী, মধুবালা, নার্গিস বানু, দেবিকা রানী আবার অন্যদিকে এলিজাবেথ টেলর, সোফিয়া লোরেন, মারলিন মনরো, ব্রিজিট বার্দো অন্যধরনের। জানি না কেন, সুচিত্রা সেনকে কখনোই একটা নির্দিষ্ট কোটায় ফেলতে পারিনি। তাঁর চুল সম্পর্কে তাঁর মেক-আপ হেয়ার স্টাইলের সঙ্গে যিনি দীর্ঘদিন ধরে জড়িত ছিলেন, সেই গোষ্ঠকুমার বলছেন, 'ভেবে দেখুন, *সপ্তপদী*র রিনা ব্রাউন। স্কার্ট-টপ, সঙ্গে ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা বয়েজকাট চুল। ফুটবল মাঠে উত্তমকুমারের দিকে রেগে গিয়ে পা ঠোকা, যাকে বলে পুরোদস্তুর অ্যাংলো

ইন্ডিয়ান লুক।

আবার ঠিক এর বিপরীতে রাখুন *হারানো সুর*। নিজে ডাক্তার, কিন্তু স্বামীর হারানো স্মৃতি ফিরিয়ে আনার জন্য উনি একটি বাচ্চা মেয়ের গভর্নেস হয়ে চলে এসেছেন উত্তমকুমারের কাছে। মধ্যবিত্ত বাঙালি সৌন্দর্যে সাবেকি এলো খোঁপায় কে বলবে ইনি সেই রিনা ব্রাউন!

'ওঁর হেয়ারস্টাইল প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মনে পড়ে যাচ্ছে, আমি যখন বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িতে যেতাম, কী প্রাণোচ্ছল, ছটফটে আচরণ করতেন মিসেস সেন। যেন বাড়ির প্রাণখোলা দিলদরিয়া এক বৌদি। সব সময় হাসছেন, হৈ-হৈ করছেন। সে সময়ে দুঃস্থ মহিলাদের দিয়ে হাতের কাজ করাতেন মিসেস সেন। মুনমুনও থাকত। লম্বা চুল সব সময় খোলা। উনি কখনও চুল ছোট করে কাটেননি। সিনেমায় যেখানে ছোট চুলে ওঁকে দেখা গেছে, জানবেন তা সম্পূর্ণই উইগ। ব্যক্তিজীবনে ওঁর চুল সব সময় টানা লম্বা। সামনের দিকটায় একটু কেটেছিলেন শেষের দিকে।

'মিসেস সেনের হেয়ারস্টাইল প্রসঙ্গে আর একটা কথা না বললেই নয়। *সাত পাকে বাঁধা* ছবিটি যদি লক্ষ্য করেন দেখবেন, স্বামীর সঙ্গে মধুচন্দ্রিমায় গেছেন, সেই সময়ে কী সাধারণ করে চুলটা জাস্ট ঘাড়ের কাছে বাঁধা, মুখে নতুন বিয়ের ঔজ্জ্বল্য... উচ্চবিত্ত বাড়ির মেয়ের সাধারণ বাড়িতে বিয়ে হওয়ায় যে রকম একটু টোন-ডাউন করে সাজা দরকার ঠিক তেমনি...। আসলে উনি জানতেন, চরিত্রের সঙ্গে মিশে যেতে গেলে কেবল পোশাক-অভিনয়ই নয়! সঙ্গে হেয়ারস্টাইল, যাবতীয় অ্যাক্সেসরিজ এমনকি ঠোঁটের ভঙ্গিটা পর্যন্ত কতটুকু ব্যবহার করতে হবে।'

বনলতা সেনের চুল জীবনানন্দের কাছে মনে হয়েছিল অন্ধকার বিদিশার নিশা, কী জানি, মিলিয়ে দেখা যেতে পারে। কিন্তু তাঁর চোখ, আপত্তি না থাকলে নয়ন বলি? সে তো ক্লান্ত অবসন্ন একটি পুরুষের কাছে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য আশ্রয়, পাখির নীড়ের মতই। তিনি নাটোরের বনলতা সেন, না কি পাবনার সুচিত্রা?

সুচিত্রা-উত্তম জুটি সম্পর্কে কিছু না বললে অতৃপ্তি থেকে যাবে। ১৯৫৩-র ২০ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পাওয়া ছায়াছবি *সাড়ে চুয়াত্তর*-এর মাধ্যমে এই জুটির জয়যাত্রা তুঙ্গে ওঠে। পরের বছর মুক্তি-পাওয়া ছবি *অগ্নিপরীক্ষার* পোস্টারটিতে সুচিত্রা সেনের সই দেওয়া পোস্টারের লেখা 'আমাদের প্রণয়ের সাক্ষী হলো অগ্নিপরীক্ষা'– পোস্টারটি আমি চোখে দেখেনি, পড়েছি তাঁর মৃত্যুর পর, এই পোস্টারটি তাঁর দাম্পত্য জীবনে ফাটল ধরাতে সাহায্য করেছিল।

ঢাকার একটি লন্ড্রির নাম ছিল সুচিত্রা লন্ড্রি– নিচে লেখা ছিল, উত্তমরূপে বস্ত্রাদি ধৌত করা হয়।

হারানো সুর ছবির প্রযোজক ছিলেন স্বয়ং উত্তমকুমার, উত্তমকুমার নায়িকা হবার প্রস্তাব দিলে সুচিত্রা সেন বলেছিলেন, 'তোমার জন্য সব ছবির ডেট ক্যান্সেল করব।'

১৯৭৫ সালে উত্তম-সুচিত্রার সর্বশেষ ছবি *প্রিয় বান্ধবী* মুক্তি পায়, ১৯৫৩ থেকে '৭৫– ২২ বছরে ৩০টি ছবিতে কাজ করেছেন।

লিটল-ম্যাগ *স্বাক্ষরের* অন্যতম সম্পাদক ইমরুল চৌধুরী, শিক্ষাবিদ-গবেষক হায়াৎ মামুদ উভয়েই থাকতেন দীননাথ সেন রোডে। ষাটের গোড়ার দিকে গর্ব করে বলতাম, এই দীননাথ সেন সুচিত্রা সেনের দাদাশ্বশুর। আমাদের শান্তিনগর ক্লাবের বজলু, বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমের কোচ, বলতেন ছোটবেলায় রমা পিসি তাদের বাড়িতে কত এসেছেন, কত আদর করেছেন। আমরা গল্প শোনার পর ওর গাল টিপে দিতাম।

সুচিত্রা সেন সহ-অভিনেতাদের সঙ্গে কেমন ছিলেন? সন্ধ্যা রায়ের সঙ্গে বিশ্বজিৎ-এর *মায়ামৃগ* দেখেছি, কিন্তু সুচিত্রা সেনের সঙ্গে তাঁর কোন ছবি দেখিনি। প্রসেনজিৎ তাঁর পিতার অভিজ্ঞতা জানিয়েছেন এভাবে: 'না মিসেস সেনের কোন পরামর্শ বা টিপস সরাসরি পাইনি আমি। তবে বাবার কাছেই শোনা একটা গল্প, সেটাই আমার জীবনে পরোক্ষে তাঁর থেকে পাওয়া বিরাট পরামর্শ। বাবা তখন সবে পা রেখেছেন ইন্ডাস্ট্রিতে। *হসপিটাল* ছবিতে সুচিত্রা সেনের বিপরীতে অভিনয়ের অফার এল। মিসেস সেন তখন তাঁর ক্যারিয়ারের শীর্ষে। একটা দৃশ্য ছিল যেখানে বাবা বলবেন, তাঁকে কতটা ভালবাসেন এবং সুচিত্রা সটান প্রত্যাখ্যান করে বলবেন, এ সম্পর্ক হতে পারে না। পরের দৃশ্যে বাবা শক্ত করে ধরবেন সুচিত্রার হাত। বুঝিয়ে দিতে চাইবেন তার ভালবাসা কতখানি এবং এ সম্পর্ক সফল হতেই পারে। কিন্তু বাবা এতটাই নার্ভাস যে, কিছুতেই হাতটা ধরে উঠতে পারছেন না। শেষমেশ মিসেস সেনই বাবাকে ডাকলেন। বোঝালেন, এ মুহূর্তটার জন্য ভুলে যাও, তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ভাব তুমি তোমার প্রেমিকার সামনে দাঁড়িয়ে। তাকেই বোঝাচ্ছ নিজের ভালবাসার কথা। শটটি দেওয়ার পর দেখা গেল কাচের চুড়ি আটকে রয়েছে মিসেস সেনের হাতে। গড়িয়ে পড়ছে রক্ত। সুচিত্রা অবশ্য নির্বিকার। বাবাকে বলেছিলেন 'গুড শট অ্যান্ড প্যাক আপ।' বাবার কাছে শোনা এ গল্পটাই আমার কাছে সুচিত্রা সেনের পরামর্শ।'

বসন্ত চৌধুরীর সঙ্গে *দীপ জ্বেলে যাই* দেখে কতবার কষ্ট পেয়েছি, কষ্ট পেয়ে কত যে আনন্দ পেয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। আর সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে *সাত পাকে বাঁধা* দেখে অবাক হয়েছি কী অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এই সুচিত্রা সেনের– কত অন্তর্জ্বালা পুষে রাখতে জানেন এই সুন্দরীশ্রেষ্ঠা।

অনেক পরে জানতে পেরেছি, *সাত পাকে বাঁধার* কাজ যখন চলছে, সে-সময়েই তাঁর পারিবারিক সংকটও চলছে, তাঁর স্বামী বিলাত-ফেরৎ স্মার্ট দিবানাথ সেনকে নিয়ে, ততদিনে একমাত্র মেয়ে মুনমুন সেনও বেশ বড় হয়েছেন। বিখ্যাত *অগ্নিপরীক্ষার* পোস্টার নিয়ে বিরোধের সূত্রে এক সময় সুচিত্রা সেন আলাদা হয়ে গেলেন। ১৯৪৭ সালে বিবাহিত জীবন শুরু, আর এর অবসান চূড়ান্ত হয় ১৯৬৯-এর নভেম্বর মাসে। দিবানাথ সেনের মৃত্যুতে। স্বামীর পদবী তিনি কখনোই ত্যাগ করেননি।

দর্শক-নন্দিত এই অভিনেত্রীর অর্জনও সামান্য নয়। ১৯৫২ থেকে '৭৮ পর্যন্ত চলচ্চিত্র শিল্পকে সমৃদ্ধ করেছেন– ৫৩টি বাংলা ছায়াছবি এবং হিন্দিতে ৭টি ছবি। মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার, শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার *দেবদাস* হিন্দি (বিপরীতে দিলীপকুমার) সিনেমার জন্য। ১৯৭২ সালে *পদ্মশ্রী* সম্মান লাভ। পশ্চিমবঙ্গের

সর্বোচ্চ বেসামরিক খেতাব *বঙ্গবিভূষণ* ২০১২ সালে। ভারতের সবচেয়ে সম্মানজনক *দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কারের* জন্য মনোনীত হয়েছিলেন ২০০৫ সালে। রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে পুরস্কার নিতে তিনি সম্মত না হওয়ায়, তালিকা থেকে তার নাম বাদ দেওয়া হয়। বলিনি হয় তো, তিনি ততদিন স্বেচ্ছায় অন্তরালে চলে গেছেন। তাঁর শেষ ছবি *প্রণয়পাশা* দর্শক টানতে ব্যর্থ হয়, আর সেবছরই তিনি লোকচক্ষুর আড়ালে চলে যান। ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজন আর চিকিৎসক ছাড়া কেউ তাঁকে দেখেননি। উত্তমকুমারের মৃত্যুর পর বেলভিউ হাসপাতালে তাঁকে দেখতে যান, আরেকবার তিনি প্রকাশ্যে এসেছিলেন, তিনি জাতীয় পরিচয়পত্র আনার জন্য কঠোর গোপনীয়তা বজায় রেখেই গিয়েছিলেন। *আনন্দবাজার পত্রিকায়* খবরটি ছাপা হলে পত্রিকা কর্তৃপক্ষকে মামলার মুখোমুখি হতে হয়। কেন তিনি অন্তরালে চলে গেলেন?

সুচিত্রা সেনের আগে এরকম ঘটনা ঘটিয়েছিলেন, পশ্চিমের গ্রেটা গার্বো। তিনি লোকচক্ষুর আড়ালে চলে গিয়ে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

বিগতযৌবনা সুন্দরীদের কী জ্বালা বলতে পারব না। তবে যাঁকে এক পলক দেখার জন্য (মৃত্যুর পরে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীতে তাঁর সম্পর্কিত কিছু ক্লিপিং ছবি দেখার জন্য) বিভিন্ন বয়সের নারী-পুরুষের যে বিরাট কিউ দেখেছি নিজের চোখে না-দেখলে বিশ্বাসই করা যেত না। অত সুন্দর ত্বকের জনপ্রিয়তা নেই, মুখে বলিরেখা, চুলের রঙ পাল্টে গেছে, চোখের সেই দীপ্তি নেই, এ তিনি সহ্য করতে পারবেন না বলেই স্বেচ্ছানির্বাসন বেছে নিয়েছিলেন। মনোরোগ বিশেষজ্ঞ কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোবিদ সুবর্ণা সেন, ইনস্টিটিউট অফ সাইক্রিয়াটিক বিভাগের এ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর পার্থসারথী বিশ্বাস বিষয়টিকে নানাভাবে দেখেছেন। এঁদের কারও কারও ধারণা, সময়মত কাউন্সিলিং পেলে অবস্থা হয়তো অন্য রকম হত। নার্সিসাস কমপে-ক্সতো থাকতেই পারে। এক সাক্ষাতে তাঁর চিকিৎসকরাও জানিয়েছেন যে, তাঁর অভিনীত কোন কোন ছায়াছবি টিভিতে দেখালে আর তাঁকে বললে তিনি বলতেন, ওটা আমার ছবি নয়, সুচিত্রা সেনের ছবি। নিজেকে, অর্থাৎ সেই সুচিত্রা সেন (১৯৭৮-এর পূর্বের)-এর প্রেমে তিনিও আমার মতই মশগুল ছিলেন।

তাঁকে শেষ দেখা দেখতে গিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মৃত্যুর পর তিনি একটা লেখা লিখেছেন যা আমি বেশ কয়েকবার পড়েছি। তিনিও প্রথম দিকে দেখা পাননি। যদিও কর্তব্য-অনুরোধে বেশ কয়েকবার গিয়েছিলেন। শেষে নিজেই তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন আর শেষ অনুরোধটি সেই নার্সিসাস কমপে-ক্সেই ইকো, প্রতিধ্বনি। তিনি লিখেছেন, 'সুচিত্রা সেন আমাদের বিশ্বজয়ী দেবকন্যা।' ৫ জানুয়ারি এই দেবকন্যা বলেছিলেন 'এখনই এসো, কাল যদি ভাল না থাকি।' তিনি লিখেছেন, '...ছিল ধর্মের প্রতি অগাধ আস্থা। তিনি রামকৃষ্ণ মঠের দীক্ষিত ছিলেন, সবাই জানি। কিন্তু তাঁর প্রতিদিনের কত সময় তিনি ধর্মাচরণে কাটাতেন, নিজের ঠাকুরঘরে একান্তে পুজো-অর্চনায় নিজেকে ডুবিয়ে রাখতেন সেটা বলার মত। এই অসুস্থতার মধ্যেও নার্সিংহোমে মঠ থেকে ফুল ও চরণামৃত এসেছে তাঁর জন্য। তাঁর শেষযাত্রার আগে এসেছেন মঠের সাধুরা।

'তবে 'মুডি' ছিলেন খুব। মেজাজ খুশি থাকলে একেবারে হাসির ধারা। আবার কোন কারণে মুড ভাল না থাকলে বা বিরক্ত হলে মুখের রেখায় চরম অভিমানের প্রকাশ। আমি নিজেই এটা দেখেছি। যদিও সৌজন্যের মাত্রা কখনও ছাড়াতেন না। মৃত্যুর দু'দিন আগেও আমাকে হাত তুলে নমস্কার জানাতে ভোলেননি। আর ফিটফাট ছিলেন এতটাই যে, ঠোঁটের ক্রিমটাও ঠিকঠাক মাখিয়ে দিতে হত।'

'সব শেষে সেই অনিবার্য প্রশ্ন। কেমন দেখতে ছিলেন এখনকার সুচিত্রা সেন? কেমন চেহারা ছিল তাঁর?

'আমাদের সবার স্বপ্নের নায়িকাকে প্রথম দেখতে যাওয়ার দিনে আমার মনেও এই কৌতূহল যে ছিল না, বলি কী করে! আর গিয়ে কী দেখলাম? শুনলে আশ্চর্য হবেন, ওনার চেহারা একেবারে আগের মতই আঁটোসাঁটো । বয়স ছাড়া ভাঙনের ছাপ নেই। কারণ যাঁরা মাথা উঁচু করে চলেন, তারা তো ভাঙতে জানেন না। তাঁর মরদেহের সামনে দাঁড়িয়েও সেই কথাটি বারবার মনে হচ্ছিল। একেবারে শান্ত, সুন্দর মুখ, যেন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে রয়েছেন। নিজস্বতায় অনড় থেকে এই চলে যাওয়া তাঁকে চিরজয়ী করে রাখল। আমরা শুধু সেই জয়ের সাক্ষী থাকলাম।'

মুখ্যমন্ত্রীকে তিনি অনুরোধ জানিয়েছিলেন যে, যেন তাঁর মৃতদেহ কেউ দেখতে না পায়। আমরা জানি, তিনি সুন্দরীতমার অনুরোধ রেখেছিলেন।

তাঁর কন্যা মুনমুন সেন জনপ্রিয় নায়িকা, তবে তাঁর মায়ের মত নিশ্চয়ই নন। রাইমা সেন অভিনেত্রী ও সুচিত্রা সেনের নাতনি লিখেছেন: 'এমনিতে মা সবসময় আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, আম্মির মত ড্রেস সেন্স আর কারও নেই।'

মা নিজেও খুব স্টাইলিশ। কিন্তু মাকে যখনই জিজ্ঞেস করেছি 'তুমি বেশি স্টাইলিশ না আম্মি? 'মা সবসময় আম্মির কথাই বলেছে।

'এখনও আম্মির ব্যাগ, আম্মির জুতা, আম্মির শাড়ি সবকিছু আলমারিতে সুন্দরভাবে রেখে দিয়েছে মা। আমরা মাঝে মধ্যে সেগুলো ব্যবহার করার সময় হয়তো একটু অযত্নে রেখেছি, সেটা দেখে মা আমাদের কী বকুনিটাই না দিয়েছে!

এত ভালবাসা যেখানে, সেখানে আম্মির চলে যাওয়ার পর মা এই শূন্যতাটার সঙ্গে কীভাবে মানিয়ে নেবে, সেটাই আমায় চিন্তায় ফেলেছে।

'হঠাৎ করে আম্মি যেন মায়ের সঙ্গে আমার বন্ডিংটাও একটু অন্য রকম করে দিল। মা সকালে উঠে আমাদের দুই বোনকে একটা করে চুমু দেয়। যতদিন আম্মি হাসপাতালে ছিল, ততদিন মা চুমু দিতে চাইলেও ভাল লাগছিল না। এই হাসপাতালে মাকে একা একা বসে থাকতে দেখে সেটাই বারবার মনে পড়ছিল। মনে হত উঠে গিয়ে বলি 'মা ভুল করেছি তোমার সঙ্গে। আরও সেনসেটিভ হওয়া উচিত ছিল আমার।' মায়ের সঙ্গে এই বন্ডিংটাও আম্মি তৈরি করে দিয়ে গেল।

'এই কয়েক দিন বেলভিউর ওই ডিপ্রেসিং ঘরটায় বসে যখনই দেখেছি কী পরিমাণ ফাইট করছে আম্মি, খালি মনে হয়েছে এই মনের জোরটা থাকলেই আম্মিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারব। শুধু এইবারটা পারল না আম্মি। আমার মায়ের বেস্ট ফ্রেন্ড চলে গেল।'

রাইমা, আর আমাদের?

আসাদ চৌধুরী কবি

শ্রদ্ধাঞ্জলি

রাজকুমারী ও কবিয়াল

অমিতাভ চৌধুরী

এক যে আছে রাজকুমারী। মেঘবরণ তাঁর চুল। না, সব কালো মেঘ নয়, সাদা মেঘেরও ঝিলিক আছে দু'এক জায়গায়। দুধবরণ তাঁর গা। না, ঠিক দুধ নয়, পাবন্মবীরভূমের রোদ খেয়ে দুধের গায়ে পড়েছে একটু বাদামি সর। তাতে তাঁকে সুন্দর লাগে আরও। তাঁর দাঁত যেন মুক্তোর সারি। না মুক্তোর চেয়েও ঝকঝকে। কালিদাস যেমন বলেছেন 'শিখরিদশনা'। ওই তন্বী শ্যামা... শ্লোকটি তো এই রাজকুমারীকে নিয়েই লেখা। তবে তাঁর চোখ দু'টি চকিত হরিণের মত নয়, যেন জল টলমল দুই দীঘি। না, না, দীঘি নয়, সাগর! মহাসাগর!

এক যে আছেন রাজকুমারী
রূপেগুণে সমান ঠিক,
চোখ দু'টি তাঁর গভীর অতল
রহস্যময় রোমান্টিক;–
একটি যদি প্যাসিফিক তো
অন্যটিও অ্যাটলান্টিক।

আমাদের এই রাজকুমারীর চলার ধরন শরীরের গড়ন রূপকথার রাজকুমারীর মতই। তবে এই রাজকুমারীর গল্পে কোনও রাজপুত্র নেই। রাক্ষস নেই, খোক্কস নেই। ব্যাঙ্গম্মাব ঢ্যাঙ্গমী হীরামন পাখি হয়তো আছে, কিন্তু তাদের দেখা মেলে না। এই রাজকুমারী বড় পর্দানশীন। নাম্লডাক্ল যশ্ল জৌলুসের রূপালি পর্দা ছেড়ে তিনি চলে গেছেন ঘরোয়া পর্দার আড়ালে। বিরাট তাঁর প্রাসাদ। বিরাট বিরাট ঘর। পাঁচমহলা বাড়ি। গোঁফ চুমরানো সান্ত্রী পথ আটকায়। বড় রাস্তা থেকে বাঁক ঘুরে ছোট রাস্তা। তারপর বিরাট ফটক। সান্ত্রী এদিক ওদিক তাকায় আর হাঁক পাড়ে 'কৌন হ্যায়?' ফটকের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় ফুলের বাগান, সবুজ ঘাস। একপাশে লাল সুরকির রাস্তা, থেমেছে গাড়িবারান্দার তলায়। ওপাশে ঘোড়াশাল, হাতিশাল। হাত্তি ঘোড়ার বদলে এখন আছে সার সার মোটরগাড়ি। ফটকে দাঁড়ালেই আরও দেখা যায় প্রাসাদের দোতলায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে কাঠগোলাপ গাছ। পাশেই দাঁড়ে বাঁধা চন্দনা। দূর থেকে

বারান্দার ভেতর দেখার জো নেই– সব চিকের আড়াল।

পাঁচমহলা প্রাসাদের নিচের তলায় লোকজন দেখা যায় না। ভেতর থেকে ঠুকঠাক। কিসের যেন আওয়াজ। গাড়িবারান্দার গায়ে উপরে যাওয়ার সিঁড়ি, ফটকের সান্ত্রীকে খুশি করে যদি ভেতরে আসা যায়, তাহলে বাহির দরজার ঘণ্টা বাজালেই তরতর করে নেমে আসবে এক প্রতিহারী। মুখে টুঁ শব্দ নেই। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলেই প্রথমে বাহিরমহল। দরজা বন্ধ। লোক নেই। তারপর রসুইখানা। খাবারদাবার টেবিল্ল চেয়ার কাঁট্টাচামচ – সব সাজানো। কিন্তু লোক নেই। রসুইখানার লাগোয়া অতিথিশালা। সব সাজানো। কিন্তু এখানেও লোক নেই। বাঁ পাশে আর একটা বিরাট ঘর। রাজকুমারীর একমাত্র মেয়ের মহল। পালঙ্ক, বিছানাপত্র, সোফাসেট– সবই আছে, আছে মন উতলা করা একটা সৌরভ। কিন্তু পুরো মহলটাই জনশূন্য– রাজকুমারীর মেয়ে রাজকন্যা প্রবাসে।

রাজকন্যার মহলের পাশে রাজকুমারীর অন্দরমহল। বিরাট পালঙ্ক, বিরাট বিরাট আলমারি। রাজকুমারী সেখানেও নেই। বড় পালঙ্কের পাশে ছোট্ট একটি তক্তপোশ। সেখানে না আছে নরম গদি, না আছে নরম বালিশ। রাজকুমারী সেই শুষ্ক শয্যায় রাত কাটান। আর দিনের বেলা? ফোন এলে ধরেন না, লোক এলে দেখা করেন না, পড়ার কাগজ গড়াগড়ি যায়।

বিরাট চওড়া বারান্দায় চন্দনা পাখিটার কাছাকাছি একটি বেতের চেয়ারে বসে শুধু দূর আকাশের দিকে তিনি তাকান আর একমনে ভেবে যান– তারপর? তারপর? মেঘ আসে, মেঘ সরে যায়। রোদ ঝরে, বৃষ্টি পড়ে। ভোরের আকাশ রাঙা হয়, বিকেলের আলো ম্লান হয়, আর রাজকুমারী অপলক চেয়েই থাকেন শিরিস আর কাঠগোলাপের ফাঁকে আকাশের দিকে। রাজকুমারীর ভাবনা কখন থামে, কখন তিনি খান, কখন তিনি ঘুমোন কেউ জানে না। বিরাট প্রাসাদের একমাত্র সহচরী সেই প্রতিহারীও কোন মহলে হারিয়ে যায় কেউ জানে না। সব চুপচাপ। কেবল একটা গভীর গোপন সুগন্ধ ঘর থেকে ঘরে ঘুরে বেড়ায়।

এমনি করেই দিন যায়, বছর যায়। রাজকুমারীর বয়স বাড়ে, কিন্তু রূপ কমে না। সেই গড়ন সেই চলন। যেন বিদ্যুল্লতা। চোখে সেই বুদ্ধির ঝিলিক, ঠোঁটে সেই বুক্কাঁপা নো মিষ্টি হাসি। তিনি একা, কিন্তু নিঃসঙ্গ নন। দূরের প্রকৃতি আর কাছের ভাবনা তাঁকে সারাদিন ব্যস্ত রাখে। বাইরের আলোয় তিনি তাকিয়েছেন অনেক, এবার তাকানো অন্তরে– ভিতরের জগতে। সেই জগতে তিনি সম্রাজ্ঞী, তাই সারা বাড়িতে এত স্বস্তি, তাঁর মুখে এত তৃপ্তি।

রাজকুমারীর একটিমাত্র মেয়ে, সেই রাজকন্যাও রূপে অপ্সরী, গুণে বিদ্যাধরী। তাজা ফুটফুটে সুগন্ধী। যেন শরতের শিউলি। এখন সে রাজবধূ। পুবের এক রাজ্যের এক রাজপুত্রের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছে। মায়ের বড় আদরের এই সুকন্যা। সে প্রবাসে, তবু তার মহল তারই মত করে সাজানো। যখন মায়ের কাছে আসে, প্রাসাদে খুশির তুফান ছোটে। মেয়ে কি তার মায়ের মত? হ্যাঁ, তাই।

এক চাঁদে রক্ষা নেই
এ যে ডবল মুন,
মায়ের মতই রূপবতী
মায়ের মতই গুণ।

এই সুকন্যা রাজবধূর সঙ্গে দেখা হয়েছিল অন্য গাঁয়ের এক সাধারণ মানুষের। তার না আছে রূপ, না আছে গুণ। কিন্তু সে মুখে মুখে পদ্য বানাতে পারে– গাঁয়ের কবিয়ালরা যেমন বানায়, তেমনি। আলো ঝলমল এক আসরে এই কবিয়ালকে ফুলের তোড়া দিতে গিয়ে রাজবধূ আবদার করে বসে এক পদ্যের। কবিয়াল তক্খুনি তাকে ওই পদ্যটি মুখে মুখে বানিয়ে উপহার দেয়।

রাজবধূ খুশি। সেদিনই তাঁর মা, আমাদের রাজকুমারীকে গিয়ে সে কবিয়ালের কথা বলে। রাজকুমারীর খেয়াল, হঠাৎ একদিন তিনি দূরের মানুষ, তুচ্ছ মানুষ ওই কবিয়ালকে ডেকে আনেন তাঁর প্রাসাদে, বলেন, আজ থেকে তুমি আমার বন্ধু।

কবিয়াল বিস্মিত, কবিয়াল পুলকিত। কিন্তু তার ভয় কাটে না, বলে, আমার না আছে ধনদৌলত, না আছে রূপযৌবন। আমি এখানে বেমানান।

রাজকুমারী বলেন, তুমি মুখে মুখে পদ্য বানাতে পার, তোমার চোখে বুদ্ধি, কথায় বুদ্ধি। পুরুষের রূপ তো ওই বুদ্ধিই। তোমার মত বুদ্ধিমান লোকের জন্যেই তো আমি অপেক্ষা করে বসেছিলাম। তুমি আমার আপনজন।

কবিয়াল এক নতুন রহস্যের মধ্যে জড়িয়ে যায়। রাজকুমারীকে সেও ভালবেসে ফেলল। এই ভালবাসায় আছে শ্রদ্ধা, আছে বিশ্বাস। আর কিছু নয়। প্রাসাদপুরীতে সে হয়ে গেল নিয়মিত অতিথি। তার জন্যে অন্দরমহলের দুয়ারও খোলা। সেও রাজকুমারীর পাশে বসে আকাশের দিকে তাকায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার করে দেয়। সূর্যাস্ত দেখে, পাখির গান শোনে। দু'জনে অমিল অনেক, তবু কাছাকাছি হয়।

দু'জনেই ঠাকুরের ভক্ত। দুই ঠাকুর। একজন পদবিতে, অন্যজন সাধনায়। কবিয়াল লৌকিক জগৎ নিয়ে তৃপ্ত, রাজকুমারী অলৌকিক স্বাদের আকাঙ্ক্ষায় অতৃপ্ত। একজন ভালবাসে নদী, অন্যজন পাহাড়। একজন ভালবাসে নীল রঙ, অন্যজন লাল। তবু কোথাও এক জায়গায় দু'জনের মধ্যে প্রচুর মিল। অসুন্দর আর সুন্দর তাই বাঁধা পড়ে এক সূত্রে।

রাজকুমারী কবিয়ালকে বলেন, আমার এই প্রাসাদ তোমার জন্য সব সময় খোলা রইল। কবিয়াল তার পড়ন্ত বেলার বন্ধুর দিকে তাকিয়ে রোমাঞ্চিত হয়, কথা বলতে পারে না। সে কি কখনও ভেবেছিল স্বপ্নে দেখা এই রাজকুমারী কোনদিন তার কাছের মানুষ হবে!

রাজকুমারী একদিন বলেন, আমার দুই নাতনি আছে। নাতনি তো নয়, দুই পরী। লাল পরী আর নীল পরী। তাদের নিয়ে পদ্য বানাতে হবে। কবিয়াল বলে, এ তোমার কঠিন আবদার। তাদের আমি দেখিনি। চেহারা কেমন, বয়স কত, হাসলে গালে টোল পড়ে কিনা, কেমন কথা বলে– কিছুই জানি না। পদ্য হবে কী করে? রাজকুমারী বলেন, দেখে

তো সবাই লিখতে পারে। না দেখে যদি লিখতে পার তাহলেই সাবাস দেব, আমার গলার মুক্তোর মালা দেব, আর বুঝব তুমি আমার সত্যিকারের কবিয়াল, সত্যিকারের বন্ধু। নাও, কাগজ কলম নাও।

রাজকুমারীর আদেশ। বন্ধুর দাবি। তাঁকে নিয়ে তাঁর মেয়েকে নিয়ে পদ্য বানিয়েছি, তাঁর দুই নাতনিকে নিয়ে না বানালে সত্যিই তো ধারা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সে রাজকুমারীর কাছে জেনে নিল বড়টির বয়স চার, নাম হিয়া। ছোটটির বয়স তিন, নয়না। কেউ কেউ রায়মা বলে। সে দিদিমাকে ডাকে 'আম্মা' বলে। দেখতে দু'জনে যেন যমজ বোন।

কবিয়াল চোখ বুজল। দেখতে পেল সামনের সবুজ ঘাসের ওপর দিয়ে দুরন্ত পা ফেলে ছুটে আসছে হিয়া– হিয়াপরী। আসছে ওই তো আসছে– আসছে।

আয়রে হিয়া কইরে হিয়া
কোথায় গেলি তুই,
আগরতলার আগরবাতি
গন্ধে তোরে ছুঁই।
এই যে হিয়া নেই যে হিয়া
কোথায় গেলি তুই,
ভোরবেলাকার শেফালিকা
সন্ধ্যেবেলার জুঁই।
মায়ের হিয়া বাবার হিয়া
কোথায় গেলি তুই,
সোনার থালা রূপার বাটি
তোরই জন্যে থুই।
দিদিমায়ের হিয়ার মাঝে
লুকিয়ে আছিস তুই,
মোর গালেতে আদর দিলি
তোর গালেতে মুই।

চোখ খুলে দেখে হিয়াপরী সামনে দাঁড়িয়ে। পদ্যটা শুনে বলল– 'বিচ্ছিরি।'

কবিয়াল দমে গেল। হিয়াপরী ভেংচি কেটে পালাল। মন্তব্য শুনে দিদিমার মন খারাপ। সে বলে– দারুণ হয়েছে। কবিয়াল, তোমার জয় হোক। এবার চোখ বোজো। বুজলেই নয়নাপরী এসে যাবে।

সত্যিই তাই। নয়না এসে হাজির। কবিয়ালের মুখ থেকে তরতর করে পদ্য বেরোয়–

নয়না আমার ময়না পাখি
কয় না কথা– দুষ্টু,
'দিম্মা' এলে 'আম্মা' বলে
তকখুনি সে তুষ্টু।
রূপটি যেন মায়ের মত
নাকি মায়ের মায়ের মত
কিংবা বাবার মাসির মত
সুশ্রী এবং পুষ্টু।
কেউ বা ডাকে 'রায়মা' বলে
নয়তো ডাকে 'আয় মা' বলে
মায়ের কোলে যায় 'মা' বলে
যখন মেয়ে রুষ্টু
পাখির মত মিষ্টি গলা
হাঁসের মত হালকা চলা
তারই সঙ্গে ছল্লাকলা
নারীর মত সুষ্ঠু।
নয়না মায়ের নয়নমণি
মিষ্টু এবং দুষ্টু।

কবিয়াল ভয়ে ভয়ে চোখ খোলে। এবারও যদি শুনতে হয় বিচ্ছিরি, তাহলে তো সব ভেস্তে যাবে।

হলও তাই। নয়না ঠোঁট উলটে বললে, 'দিদি ঠিকই বলেছে– বিচ্ছিরি'– বলেই দৌড়।

রাজকুমারী কবিয়ালকে সান্ত্বনা দেন, বলেন, ওরা ছেলেমানুষ। বড় হয়ে তোমার পদ্যের মর্ম বুঝবে, যেমন আমি বুঝতে পারি।

কবিয়াল তবু মনমরা হয়ে থাকে। রাজকুমারী তখন তার পিঠে হাত রেখে বলেন, তুমি তো আমার কবিয়াল। অন্যের নও। আমি যদি খুশি থাকি, তাহলে আর কী চাও? তোমার পদ্যে আমি খুশি।

রাজকুমারীর কথায় মনমরা কবিয়াল চাঙ্গা হয়। খুশিতে বলে ওঠে– খিদে পেয়েছে।

রাজকুমারী বলেন, এই তো চাই। এসো, দু'জনে চিকেন চাউমিন খাই, চিংড়ির মালাইকারি খাই। পেট ভর্তি করে আইসক্রিম খাই।

এত সব খাওয়ার কথা শুনে কবিয়াল আরও খুশি হয়ে বলে, এবার আমি শুধু তোমাকে নিয়েই পদ্য বানাব, আর কাউকে নিয়ে নয়। তুমি খুশি হলেই আমি খুশি।

রাজকুমারী বলেন, ঠিক ঠিক ঠিক। চলো খেতে যাই। 'পেট খুশি তো মন খুশি, অন্য কিছু শুধুই ভুষি।' কী, দেখলে তো, তোমার প্রভাবে আমিও কেমন পদ্য বানাতে শিখে গেছি। আমার পদ্য ফুরোল, মুরগির সুপ জুড়লো। তাহলে সুপ দিয়েই শুরু করা যাক।

অমিতাভ চৌধুরী ভারতের কবি, ছড়াকার

happy 2014 Coca-Cola

'Coca-Cola', 'Coke', the 'Contour Bottle' and the 'Dynamic Ribbon' are the registered trademarks of The Coca-Cola Company. 'Coca-Cola' contains no fruit. 'Coca-Cola' contains added flavours.

সুচিত্রা সেনের বাড়ি

শ্রদ্ধাঞ্জলি

আমার বাল্যবন্ধু

ফুলরানী কাঞ্জিলাল

পাবনার কথা আজও ভুলতে পারিনি। সুন্দর ছিমছাম পরিষ্কার টাউন পাবনা। এখন বাংলাদেশে। আজ বাল্যকালের স্মৃতিগুলো বড় মধুর লাগে। বন্ধুদের সঙ্গে সেই হাসি খেলার দিনগুলো আজ কতদূরে চলে গেছে! কিন্তু স্মৃতিগুলো রয়ে গেছে আমার কাছে। কৃষ্ণা (সুচিত্রা সেন), মঞ্জুশ্রী (মঞ্জুশ্রী চাকি, ডান্সার্স গিল্ডের স্রষ্টা), রেবা, রেখা, শিপ্রা, মলয়া, প্রতিভা, বাসন্তী, কণা এসব ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের স্মৃতিগুলো আজও যেন জীবন্ত লাগে। চৈত্রের শেষে আর বৈশাখের প্রথমে সেই কালবৈশাখীর তাণ্ডব। তার সঙ্গে প্রচ- শিলাবৃষ্টি। মনে করলে আজও রোমাঞ্চ হয়।

কলকাতা থেকে পাবনা যেতে গেলে শিয়ালদহ স্টেশন থেকে ট্রেনে চড়ে ঈশ্বরদি স্টেশনে নামতে হত। আসাম মেলে গেলে ঘণ্টাতিনেক লাগত। পাবনার কোনও রেল স্টেশন ছিল না। ঈশ্বরদি স্টেশন থেকে বাস। সুন্দর পিচের রাস্তা দিয়ে সেই বাস চলত পাবনা টাউন পর্যন্ত। বাস জার্নিটাও ছিল বড় সুন্দর। দু'দিকে বড় বড় গাছ। মাঝখানে পিচের রাস্তা। গাছের পেছনে ধানের খেত বা বাগান, তার মাঝে ছোট ছোট চালা ঘর। চোখ জুড়ানো দৃশ্য! প্রায় এক ঘণ্টা লাগত পাবনা পৌঁছতে।

১৯৪৭ সাল। দেশ ইতোমধ্যেই বিভক্ত। কৃষ্ণার সঙ্গে আমার পাবনায় শেষ দেখা সেই বছরই ওর বিয়ের সময়। তখন মনের অবস্থা সকলেরই খুব খারাপ। পাবনা ছেড়ে চলে যেতে হবে চিরদিনের জন্যে। এতদিন যে জায়গাটাকে নিজের জায়গা, যে বাড়িটাকে নিজের বাড়ি মনে করেছিলাম হঠাৎ একদিন রাত পোহালে, দেখলাম সেটা আমার নয়।

সেই অতীতের পাবনা টাউন। একপাশ দিয়ে পদ্মা আর ইছামতী বয়ে গেছে পাশাপাশি। বর্ষাকালে কোনও কোনও জায়গায় এই ইছামতী আর পদ্মা এক হয়ে যেত। কুষ্টিয়া এবং শিলাইদহ যাবার স্টিমার চলত পদ্মার ওপর দিয়ে। আবার শীতের সময় ইছামতী শুকিয়ে যেত প্রায়। পায়ে হেঁটে পার হওয়া যেত। পদ্মা আর ইছামতী আবার আলাদা হয়ে যেত। ইছামতীর চরে ঘন কাশবন জন্মাত। লোকে এই ঘন কাশবনে ঢুকতে বারণ করত ছোট ছেয়েমেয়েদের। বলত কাশবনে বাঘ থাকে। কিন্তু আমি, কৃষ্ণা, মঞ্জুশ্রী এবং আর সকলে একথা শুনতাম না।...

পাবনা টাউনের চারিদিকের দৃশ্যের মধ্যে একটা স্নিগ্ধতা ছিল। পিচের বড় রাস্তার দু'ধারে কাঠবাদাম, বট, অশ্বত্থ গাছ। কখনও বা বড় কম্পাউন্ড নিয়ে লোকজনের বাড়ি। ছোট দেয়াল দিয়ে ঘেরা কম্পাউন্ডের মধ্যে আম, জাম, জামরুল, কাঁঠাল বা কুল গাছ। কোথাও বা কম্পাউন্ডের মধ্যে ভেজিটেবল গার্ডেন। আর সকালবেলা কাছারি বাড়ির পাশে থানায় পুলিশের বিউগ্‌ল। এগুলো আজ সুখস্বপ্ন হয়ে গেছে।

পাবনা টাউনের চারিদিকের দৃশ্যের মধ্যে একটা স্নিগ্ধতা ছিল। পিচের বড় রাস্তার দু'ধারে কাঠবাদাম, বট, অশ্বত্থ গাছ। কখনও বা বড় কম্পাউন্ড নিয়ে লোকজনের বাড়ি। ছোট দেয়াল দিয়ে ঘেরা কম্পাউন্ডের মধ্যে আম, জাম, জামরুল, কাঁঠাল বা কুল গাছ। কোথাও বা কম্পাউন্ডের মধ্যে ভেজিটেবল গার্ডেন। আর সকালবেলা কাছারি বাড়ির পাশে থানায় পুলিশের বিউগ্‌ল। এগুলো আজ সুখস্বপ্ন হয়ে গেছে।

আমার বাবা পাবনায় পাবলিক প্রসিকিউটর ছিলেন। নিজেই বিরাট বড় বাড়ি করেছিলেন। তিনি যথেষ্ট সৌখিন লোক ছিলেন। বাড়ির সমস্ত সামনেটা জুড়ে ছিল ফুলের বাগান। ছোট পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। বাড়ির মেয়েদের খেলাধূলার জন্য বাড়ির ভেতরে ছিল বিরাট উঠোন। উঠোনের একদিকে মূল বাড়ির পাশে রান্নাঘর আর খাওয়ার ঘর। তার পাশে বাথরুম। বাথরুমের সামনে বাঁধানো জায়গার মধ্যে টিউব ওয়েল। উঠোনের আর এক পাশে লক্ষ্মীর ঘর আর নিরামিষ ঘর। মূল বাড়ি ও রান্নাঘরের মাঝখানের প্যাসেজ দিয়ে পেছনে কুয়োতলা আর গোয়াল ঘরে যাওয়া যেত। গোয়াল ঘরের পাশে ভেজিটেবল গার্ডেন। সামনেটা ছাড়া বাড়ির তিনদিকটাই উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছিল।

বাড়ির সামনে রাস্তার ওপারে পলিটেকনিক হোস্টেল। হোস্টেলে একতলা পাকা বাড়িগুলো ভেতরের সবুজ মাঠটাকে চতুর্ভূজের মত ঘিরে রয়েছে। এই সবুজ মাঠে আমরা শৈশবে প্রায়ই চোর চোর বা কানামাছি খেলতাম। কৃষ্ণাও অনেকবার আমাদের সঙ্গে থাকত।...

আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে বড় রাস্তায় পড়ে বাঁ দিকে গেলে বাঁহা তে প্রথম এসডিওর বাড়ি। তার উল্টোদিকে আমার আর এক বাল্য বন্ধু মঞ্জুশ্রী চাকীর (সরকার, ডান্সার্স গিল্ডের স্রষ্টা) বড় তিনতলা বাড়ি। তার পাশে কৃষ্ণার (সুচিত্রা সেন) একতলা বাড়ি। কৃষ্ণার বাড়ির উল্টোদিকে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট। মঞ্জুশ্রীর বাড়ির পাশ দিয়ে বড় রাস্তা থেকে আর একটা রাস্তা বেরিয়ে গেছে আমাদের রান্নাঘরের পেছনে মাঠের পাশ দিয়ে। আমাদের বাড়ির তিনতলায় উঠলে মাঠের ওপারে মঞ্জুশ্রীর বাড়ি স্পষ্ট দেখা যেত। কৃষ্ণার (সুচিত্রা সেন) বাড়ি একতলা বলে অন্য বাড়ির আড়ালে পড়ে যেত তাই দেখা যেত না। ওই মাঠের পাশের রাস্তা দিয়ে মঞ্জুশ্রী আর কৃষ্ণা স্কুলে যেত একসঙ্গে। আমরা তিনজনেই পাবনা গালর্স হাই স্কুলে পড়তাম। প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন অমিয়া সেন। আমরা দুজনেই প্রায় সমবয়সী। কৃষ্ণার জন্ম সম্ভবত ১৯৩১এর এপ্রিল এবং আমার ১৯৩২এর শুরুতে। একে সমবয়সীই বলে। কৃষ্ণা আর মঞ্জুশ্রী একই পাড়ার মেয়ে।

কৃষ্ণার (সুচিত্রা সেন) বাবা স্বর্গীয় করুণা দাশগুপ্ত সরকারি কর্মচারী ছিলেন। কৃষ্ণার ঠাকুর্দার নাম ছিল স্বর্গীয় জগবন্ধু দাশগুপ্ত। কৃষ্ণার মায়ের নাম ইন্দিরা দাশগুপ্ত। দেখতে খুবই সুশ্রী। তিনি গৃহস্থ বধূ ছিলেন। কৃষ্ণারা চার ভাই পাঁচ বোন। বড়ভাই নিতাই, মেজ নিমাই, সেজ গৌর ও ছোট গৌতম। ছোটভাই দেখতে খুবই সুন্দর ছিল। সিনেমা জগতে এলে দ্বিতীয় উত্তমকুমার হত হয়তো।

বোনদের মধ্যে বড় উমা, মেজ কৃষ্ণা, সেজ হেনা, চতুর্থ লীনা ও পঞ্চম রুণা। উমাদি আমার সেজদি মায়া চৌধুরীর (কাঞ্জিলাল) সঙ্গে একই ক্লাসে পড়তেন। উমাদির গায়ের রং শ্যামলা, মাঝারি হাইট্ দেখতে সুশ্রী। খুব টিপ্‌টপ্ থাকতেন। খুব মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে ছিলেন। ওঁর সঙ্গে আমার এখনও যোগাযোগ আছে। কৃষ্ণা ছিল খুবই সুন্দরী। সেটা আর নতুন করে কিছু বলার নেই। কৃষ্ণাকে ছোটরা রাঙ্গাদি বলত। অ্যালবার্ট করে চুল বাঁধাটা তখন একটা ফ্যাশন ছিল। উমাদি এবং কৃষ্ণা দু'জনেই অ্যালবার্ট করে চুল বাঁধত। সেজবোন হেনার রং ফর্সা ছিল। লম্বা দোহারা গড়ন। দেখতে ভালই।

চতুর্থ লীনা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ ছিল। দেখতে সুশ্রী। পঞ্চম রুণা। মুখখানা খুবই মিষ্টি ছিল। রুনা রবীন্দ্র সঙ্গীত ভাল গাইত। পরে রুণা সঙ্গীত ভবনে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে গান শিখেছিল। রুণার বিয়ে হয় ক্যামেরাম্যান বারীন ধরের সঙ্গে।

কৃষ্ণাদের সঙ্গে ওর তিন অবিবাহিত পিসি থাকতেন। দুই আপন পিসি কমলা আর কুন্তি আর খুড়তুতো পিসি বাণী। ওরা বাণী পিসিকে ফুলপিসি ডাকত। কমলা পিসি কিছুদিন থাকার পরই বিয়ে হয়ে যায়। বাণী পিসি আমাদের পাবনা গালর্স স্কুলের টিচার ছিলেন।

১৯৪৭ সাল। দেশ ইতোমধ্যেই বিভক্ত। কৃষ্ণার সঙ্গে আমার পাবনায় শেষ দেখা সেই বছরই ওর বিয়ের সময়। তখন মনের অবস্থা সকলেরই খুব খারাপ। পাবনা ছেড়ে চলে যেতে হবে চিরদিনের জন্যে। এতদিন যে জায়গাটাকে নিজের জায়গা, যে বাড়িটাকে নিজের বাড়ি মনে করেছিলাম হঠাৎ একদিন রাত পোহালে, দেখলাম সেটা আমার নয়। এর ধাক্কাটা যে কি প্রচণ্ড তা এ ঘটনা যার জীবনে ঘটেছে সেই একমাত্র উপলব্ধি করতে পারবে। তাছাড়া বাড়িতেও আপনজনের খুব অসুস্থতা ছিল তখন। আমরা সকলেই খুব উদ্বিগ্ন ছিলাম। সত্যি কথা বলতে কি কৃষ্ণা একরকম জোরাজুরি করাতেই আমাকে তার বিয়েতে উপস্থিত হতে হয়েছিল সেই সময়। বোধহয় তার মনে একটা সন্দেহ হয়েছিল যে তখনকার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমি বিয়েতে নাও যেতে পারি। তাই নিজের হাতে একটা চিঠি লিখে বড়ভাই নিতাইয়ের হাত দিয়ে পাঠিয়েছিল বিয়ের দিন সকালে আমাকে বিয়েতে যাবার জন্য অনেক অনুরোধ করে। ব্যাস্, কৃষ্ণার সঙ্গে আমার আর কোনদিন

দেখা হয়নি, এরপর যে ক'টা দিন পাবনায় ছিলাম।

কৃষ্ণা (সুচিত্রা সেন) শৈশব থেকেই আমার বন্ধু ছিল বলে আমার মোটামুটি ওর সব ধরন্ন ধারণগুলোই জানা। শৈশব থেকেই দু'জনে দু'জনের বাড়িতে যাতায়াত করেছি এবং বহুক্ষণ কাটিয়েছি। কৃষ্ণা শিশুকালে কথাবার্তা কম বলত। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উঁচু ক্লাসে ওঠার পর খুব কথা বলতে লাগল এবং হল্লা করতে লাগল। অনেক ব্যাপারে অগ্রণী হতে লাগল। এই কম কথা বলার একটা কারণ থাকতে পারে। ওর শৈশবে একটা উচ্চারণে অসুবিধে ছিল। 'খ'বর্ণটা উচ্চারণ করতে পারত না। বাবা হয়তো স্নান করবার জন্য তৈরি হচ্ছেন, কৃষ্ণা জিজ্ঞেস করল, 'বাবা তুমি কি তেল মারবে?' অর্থাৎ তুমি কি তেল মাখবে। এরকম কোনও কোনও বর্ণ উচ্চারণের অসুবিধে কিন্তু অনেক শিশুর হয়ে থাকে এবং বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ঠিক হয়ে যায়।... কৃষ্ণাকেও অবশ্য খুব বেশিদিন 'খ'কে 'র' বলতে শুনিনি। বললে হয়তো উত্তরজীবনে ওকে নায়িকা হতে হত না। মনে আছে ওদের বাড়িতে শিশু বয়সে গেলে দেখতাম কৃষ্ণা রান্নাঘরে ঢুকে ওদের রান্নার ঠাকুরের কাছ থেকে জোর করে খোন্তা কেড়ে নিয়ে বলত, 'তুমি সরে যাও আমি আন্না করব'। পরে কৃষ্ণাকে এসব কথা স্কুলে বললে কৃষ্ণা মনে হয় একটু লজ্জা পেত। চুপ করে থেকে অল্প অল্প হাসত। এরকম সব শিশুরই কোনও না কোনও জিনিসের প্রতি আকর্ষণ বা আগ্রহ থেকে থাকে শিশু বয়সে। এটা কিছু একক ব্যাপার নয়।... ওই শিশু বয়সে কৃষ্ণা হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নিজেই গান গেয়ে নাচত। ওই দেখে দেখে আমিও ওর অনুকরণ করতাম। ও কি গান গাইছে ভাল করে বুঝতেও পারতাম না। সুর খুব একটা ছিল না বলেই মনে আছে। গানটা নিশ্চয়ই ওর কোনও শোনা গান। তবে নাচটা ওর নিজেরই রচনা। নাচের দিকে বরাবরই ওর একটা তীব্র আগ্রহ ছিল। কোনও গান রেকর্ডে বাজলেই হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নাচবার চেষ্টা করত। আমি শুধু তখন অবাক হয়ে হাঁ করে দেখতাম আর ভাবতাম কি অপূর্ব নাচছে কৃষ্ণা গানের তালে তালে। আমিও তখন ওর সঙ্গে নাচতে চেষ্টা করতাম। তবে এটাও ঠিক যে গানের তাল তখন কোনদিকে ছিল আর নাচের তালই বা কোনদিকে ছিল হলফ করে এখন বলতে পারব না। উত্তরজীবনে এই নাচের লিপ্সাটা তার মধ্যে ভীষণভাবে বজায় ছিল। হয়তো অভিনয় করার ক্ষমতাটা তার এই লিপ্সারই অন্য একটা বিকাশ।

যদিও কৃষ্ণা শৈশব থেকে বিয়ে পর্যন্ত পাবনায় কাটিয়েছিল কিন্তু ওর আদি বাড়ি ছিল যশোহর। কৃষ্ণা জয়েন্ট ফ্যামিলিতে বড় হয়েছে। ওর মামাবাড়ি ছিল পাবনায়। ওর মা পাবনার মেয়ে। ৬ এপ্রিল, সম্ভবত ১৯৩১ সালে ওর জন্ম হয় পাবনায়। ছোটবেলা থেকেই ও খুব ফুটফুটে সুন্দরী এবং স্বাস্থ্যবতী ছিল। ওর বাবার কর্মস্থল ছিল পাবনা। কর্মোপলক্ষ্যে তাঁকে বহুদিন পাবনায় থাকতে হয়। তাই কৃষ্ণা জ্ঞান অবধি পাবনাকেই চেনে। পাবনার বাল্যকালের স্মৃতি রোমন্থন করে।

ছোটবেলা থেকেই কৃষ্ণা খুব পুতুল খেলতে ভালবাসত। আমার পুতুল খেলার দিকে বিশেষ আকর্ষণ ছিল না। দৌড়াদৌড়ি নাচানাচি এসবগুলোই আমার বেশি প্রিয় ছিল। তাই এ ব্যাপারে ওর সঙ্গী হত কৃষ্ণার পাশের বাড়ির আমাদের আর এক বাল্যবন্ধু মঞ্জুশ্রী (চাকী সরকার, ডান্সার্স গিল্ডের স্রষ্টা)। পুতুল খেলা নিয়ে কি ঝগড়াটাই না হত দু'জনের মধ্যে! ঝগড়া হতেই কৃষ্ণা আর মঞ্জুশ্রী দু'জনে দু'জনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হাতের বুড়ো আঙ্গুলটা থুতনির নীচে ঠেকিয়ে বলত আড়ি, আড়ি, আড়ি। ব্যস দুজনের কথা বন্ধ। ওমা বিকেলবেলা গিয়ে দেখি দু'জনে নিবিষ্ট মনে একসঙ্গে পুতুল খেলছে। যেন কখনও কিছু হয়ই নি। এটা ছিল পুতুল খেলার একটা অঙ্গ বিশেষ।

আমরা যখন একটু বড় হয়েছি অর্থাৎ বালিকা হয়েছি তখন কৃষ্ণার আর মঞ্জুশ্রীর দু'জনের পুতুলের বিয়ে হল। সে এক এলাহি ব্যাপার! পুতুল দুটো বেশ বড় সাইজের ছিল। প্রথমে তো কার ছেলে হবে আর কার মেয়ে হবে এই নিয়ে দু'জনের প্রচণ্ড তর্ক বিতর্ক। তারপর বহু কষ্টে মঞ্জুশ্রীর ভাইপো নেপুর মধ্যস্থতায় রফা হল।...(সংক্ষিপ্ত)

ফুলরানী কাঞ্জিলাল
ভারতের লেখক

ভারত সম্পর্কে নিয়মিত জানতে লাইক ও ভিজিট করুন আমাদের page: High Commission of India, Dhaka

ছন্নছাড়া একান্ত রোদ্দুর

সায়ন্তনী ভট্টাচার্য

অসামান্য আলো– রাত্রিবাস কেঁপে যায়, সূর্য প্রবাসী
এপাশে মৃত নগরী– ওপাশে চাঁদের বিছানা
মধ্যিখানে ঠাঁটপোড়া রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে সোস্যালিস্ট

ঘুম শুকিয়ে যায় বাড়ন্ত আশ্বিনে– আলোপাশ চেয়ে চেয়ে
কবরের পাশে তুমি, সপ্তডিঙা মধুকর– বেহুলার চোখ
কামহীন, ছানিকাটা সাদা, বুকের ভেতরে মুখ
চেয়ে আছে লখাইসুন্দর– দিব্যি মেলেছে চোখ
স্তনের ভিতর– গোলাকার সভ্যতা
বধিরতা দেখে টেখে বাদাম ভাজায় সামান্য নুন ছেটায়, কিছুটা পানীয় জল

আমার ছড়ানো দুপুর ছিন্নভিন্ন হয়, তপ্ততা বুঝেটু ঝে
যেই মাত্র উগরেছি হৃদপি- জলে, বাঁশিটিও তেমন খালাস

বসে আছি– মেঘের বাংলাঘরে জাদুটোনা নিয়ে বসে আছি
ফ্যাকাসে পৃথিবীর কাছে ঘর– বাগানে রকিং চেয়ার, এবং
শূন্যতাও এলোমেলো শিখিয়েছে নন্দিত শ্লোগান, রাজসিক প্রেম

সায়ন্তনী ভট্টাচার্য ভারতের কবি

অজ গাঁয়ে

দেবী রায়

বিয়াল্লিশ ডিগ্রি উষ্ণায়নে, সফটওয়ার আইকন
সস্ত্রীক আপনার পদার্পণ
এই অজ গাঁয়
যেখানে বেশির ভাগ গ্রামবাসী
কথা বলে
নতুন কেনা মোবাইলে!

আহাম্মকের মত নিজেকে জাহির?
রাস্তা অবরোধ মিছিলে মিছিলে!
ধীর স্থির
কারা আজ উল্টে দিতে চায়,
সব ছক
এই বিশ্বায়নে
এইসব গ্রামবাসিরা কোথায়–
বা তাদের স্থান? তারা কি কেবলি
ভোটার, নীরব দর্শক!

দেবী রায় ভারতের কবি

নিরুত্তর পাহাড় জমেছে

সোহেল অমিতাভ

অনেক পাথর নিয়ে বসে আছি
সঙ্গে আছে রৌদ্রদগ্ধ জ্বলন্ত দুপুর
হাতের হাতুড়িতে আছে দক্ষতা
আর প্রাচীনতা অবশেষ।

দেহের যতটা শক্তি পুরোটা দেবার নয় এই কাজে
তাই অদৃষ্টে ভর করে আছি
যদি কোন দৈব্লদুর্বি´পাকে ভেঙে যায় পাথরসমূহ
তবেই নির্মিত হবে ইমারত, সুখি গৃহকোণ!

এখন পড়ন্ত বেলা অবসন্ন দীর্ঘশ্বাস বহে
উত্তরআধুনিক প্রেমে
নিরুত্তর পাহাড় জমে ওঠে!

যদি

মনীশ মৌলিক

যদি বোধ ছুঁয়ে শব্দ গড়ি
ছন্দ বাজে চেতন্নবীণার,
বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে চাপা দীর্ঘশ্বাস।

যদি কাল ছুঁয়ে শব্দ ধরি
কথা বলে অতীত্নমিনার,
ফুটে ওঠে বেদনার গাঢ় প্রতিভাস।

মনীশ মৌলিক ভারতের কবি

এ জীবনে

অমিতাভ চক্রবর্তী

এ জীবনে সবকিছু হয়তো বা পেয়ে গেছি,
মনে হয় পাবার আর কিছুই বাকি নেই।

এ জীবনে সব কিছু হয়তো বা হারিয়েছি,
মনে হয়, হারাবার আর কিছু বাকি নেই।

তবু জানো অজান্তে দু'হাতের মুঠো খুলে যায়...
জানি না, এখনো পাবার কিছু আছে নাকি বাকি

অথবা সবটাই এ্লজ ন্মের শেষ্লবি স্ময়,
অন্ধের চোখে আলো বোবারাও বাঙ্ময়!

একটা জীবন চিরটা কাল রহস্য ঘেরা রয়ে যায়।

অমিতাভ চক্রবর্তী ভারতের কবি

শেষ বিকেলের কষ্ট

রিপন আহম্মেদ

মৌ মৌ ঘ্রাণে রাস্তার চার পাশে
অনেক মানুষের ভীড়,
কষ্ট করে মাথাটা উঁচু করে
হাত নাড়তেই ঋতুর্পণা সেন
মুচকি হেসে চোখের পলকে
হারিয়ে গেল অগণিত মানুষের মাঝে।

শেষ বিকেলের দিকে
জেসগার্ডেনের পাশে অনেক মানুষের আনাগোনা
ভাবি হয়তো বা ওখানেই আছে, ঋতুপর্ণা সেন
ছুটে যাই জেসগার্ডেনে।
শুটিংএ ব্যস্ত কোয়েল মল্লিক।
নিজেকে বড় প্রসেনজিৎ ভাবতে ইচ্ছে করল।

ঘড়ির দিকে তাকাতেই বলল– যেতে হবে।

চোখ খোল চন্দ্রমুখী

মাহমুদ হাফিজ

(জীবনের সঙ্গে লড়াইরত নাজনীনকন্যা চন্দ্রমুখী স্নেহভাজনেষু)
চোখ খোল চন্দ্রমুখী
এই আক্রান্ত ঘুমচোখ একদম সাজে না তোমার
এখন জীবনের কোলাহলে অযুত প্রার্থনাধ্বনি
দূরান্তের ভূগোল ভেঙে ত্রিপুরা বা নিউইয়র্ক থেকে
কত মানুষ নিয়ে এসেছে মুঠোভরা আলো ও গোলাপ
কোন্ অভিমানে ঘুমচোখে শুয়ে আছ এই রোদ্দুরভোরে?

শিয়রে জননী নির্ঘুম, বারান্দায় নীরবে কেঁদে কেঁদে
বাবা করে চলেছেন পৃথিবীর কঠিনতম পায়চারি
কানাডা ক্যালগেরি ক্যানবেরায় করজোড় মোনাজাত
তোমার পাথরচোখে একটুও দয়া নেই?

জীবাণুবাহিত বিছানা ছেড়ে উঠে এস বাড়ি
নানাভাইয়ের দাড়ি ধরে টান মেরে দৌড় দাও
বাবার সঙ্গে খেলে যাও বিড়াল লুকোচুরি
শ্লো কেসের দামি আসবাব ভেঙে লুকোও গিয়ে সিঁড়িঘরে
আজ কার এমন সাহস তোমাকে শাসায়?
উঠে এস চন্দ্রমুখী... দ্রুত উঠে এস... উঠে এস... উঠে...

তুলে দেব উদ্ভিন্ন যৌবন

শিরিন সুলতানা

ও আমার পোড়ামুখী ভালবাসা
আজ ফিরে যাও আর জেনে যাও
অনেক অনেক আগেই মানবিক অনুভূতিগুলো
জমা পড়েছে দুঃখের হাটে
বিশ্বাসঘাতকতা করেও শান্তি পায়নি ভাগ্য
এখন শোনাচ্ছে অসভ্য ভাষা
মন্ময় শরীর জুড়ে যে তর্ক– তা ক্লান্ত হতে হতে ক্লান্ত
মিষ্টি মিষ্টি অভিসার পুরনো বর্গায়
সময়ের ব্যবধান নিশাচর পাখির মত উড়ে বেড়ায়
তাকে ধরার মত সামর্থ্য যদি থাকে
তাকে পাবার মত ব্যাকুলতা যদি থাকে
তাকে অস্তিত্ব ভাবার মত থাকে যদি মন
গুটি গুটি পায়ে হলুদিয়া বন্দরে এস
জীবনের জাহাজে তুলে দেব
সহস্র কোটি উদ্ভিন্ন যৌবন।

কেন খোঁজো কোথায় থাকে কবি

খায়রুল আলম সবুজ

কেন খোঁজো কোথায় থাকে কবি
ছায়ার মত পিছু পিছু তার
কেন? কি আছে জানার?
ব্যক্তিতে কবি সমষ্টিতে কবি
জাতে কবি অজাতে কবি
দেশে আছে কবি দলে আছে কবি
পৃথিবীর কোণায় কোণায় বসতবাড়ি তার
তবু কেন খোঁজো বার বার
কি আছে জানার?

কোথায় যায় কবি কথা কয় কার সাথে
কারে কাছে টেনে নেয় কারে রাগে দূরে
কবি থাকে গহীন অন্তঃপুরে
এসব জেনে কি হবে তোমার?

কবি থাকে নদীতে সাগরে
ঘোলাজলে জোয়ার ভাটায়
নিদ্রিত সবুজ পাতার 'পরে
ঝরাপাতা ঝরার বেলায় কবি ঝরে পড়ে
দিনের শেষে নীলাম্বরী সাঁঝে
কবি থাকে মেঘের ভাঁজে ভাঁজে
মানুষের মাঝে মানুষ খোঁজে কবি
দেবে তার বুকের ছবিটারে
তাই– খোঁজে কবি নিত্য কবিতারে
তারে তুমি কেন খোঁজ বারে বারে?

বাণী বন্দনা

বিদ্যাদেবী সরস্বতীর অর্চনা

স্বামী স্থিরাত্মানন্দ

মাঘী শুক্লা শ্রীপঞ্চমী তিথিতে দেবী সরস্বতীর বিশেষ বন্দনা। এই শীতের হিম-জড়তা ছেড়ে পাঁচ বছরের বিদ্যার্থী শিশুটি মায়ের কৃপায় বিদ্যালাভ করে বিদ্যার স্নিগ্ধ আলোতে পূর্ণিমার চাঁদ হয়ে উঠবে। তাই বুঝি পঞ্চমী তিথিকে বেছে নিয়েছেন পৌরাণিক মুনিগণ।

ঐতিহ্য স্মরণ করেই সরস্বতী পূজার এ আয়োজন। পৌরাণিক যুগে ঋষিগণ তাঁদের ঋষিত্ব লাভ করতেন এ মেধারূপিণী সরস্বতীর আরাধনা করে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব সর্বদা সরস্বতীর চরণবন্দনা করেন। তিনি দেবী– বিদ্যাদানে দিব্যচেতনায় তিনি আলোকিত করেন মানুষের অন্তর। তিনি মেধারূপে আমাদের সত্তায় বিরাজ করেন। এ মেধা ছাড়া কি জ্ঞানলাভ সম্ভব? শ্রদ্ধাবান হলেই এ মেধা লাভ হয়। এজন্য তাঁর পূজার আয়োজন। হৃদসরোবরে শ্বেতশুভ্র ভক্তিপদ্মে বসিয়ে পূজা করতে হয় তাঁর– সম্মান জানাতে হয়, স্তুতি করতে হয়।

কিভাবে অনুভব করি তাঁকে? মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরা আমাদের জন্য সে ব্যবস্থা করেছেন। তাঁরা অনুভব করেছেন– দেবী সরস্বতী সমগ্র বিদ্যার স্বরূপ। তিনি সৎ-ব্যক্তিদের অন্তরে শুভ বৃত্তিরূপে বিরাজ করেন। ফলে তাঁরা সুন্দর জীবনযাপন করে বিদ্যালাভে ধন্য হয়ে জগতের কল্যাণে নিজেদের নিয়োজিত করেন। তাঁর কৃপায় সকল প্রকারের বিদ্যাই লাভ হয়। চিকিৎসাবিদ্যা, প্রকৌশলবিদ্যা, ধনবিদ্যা, মনোবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি সকল বিদ্যাই শ্রদ্ধা আর মেধার মণিকাঞ্চনযোগে লাভ হয়। এ বিদ্যাদেবী সরস্বতীর মহিমাই ঘোষণা করে। আবার সরস্বতী ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপিণী। ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করে মানুষ মোহমুক্ত হয়ে পরম আনন্দের অধিকারী হয়। বিদ্যার দেবী, মেধার দেবী, সুরের দেবী সরস্বতী শ্বেতপদ্মে, শুভ্রবস্ত্রে শোভিতা হয়ে শ্বেতহংস বাহনে আগমন করেন। শ্বেতচন্দন ও শ্বেতপুষ্পে অর্চিতা হলে তিনি খুশি হন।

কারণ তিনি সত্ত্বগুণেই বিদ্যারূপে বিকশিতা হন। তিনি প্রসন্না হলে বোবার মুখেও বাকস্ফূর্তি ঘটে, মূর্খও পণ্ডিত হয়ে সর্বত্র সাফল্য লাভ করে। আর দীন-দরিদ্রও বিদ্যাধন বা অন্য সম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। বিদ্যাদেবী জাগতিক সমৃদ্ধি যেমন দিয়ে থাকেন, তেমনই দিয়ে থাকেন মুক্তির পরম আনন্দ।

সরস্বতী রহস্যোপনিষদ্এ আ ছে– যঃ কবিত্বং নিরাতঙ্কং ভুক্তিমুক্তী চ বাঞ্ছতি। সোহভ্যর্চেনাং ... নিত্যং স্তৌতি সরস্বতীম্ ॥ অর্থাৎ, যিনি কবিত্ব বা বিদ্যা চান, যিনি ভয় থেকে মুক্ত থাকতে চান, যিনি সংসারে সুখ বা সংসারবন্ধন থেকে মুক্তি কামনা করেন, তিনি প্রতিদিন স্তুতি করে সরস্বতীর আরাধনা করেন।

বসন্তপঞ্চমী বা শ্রীপঞ্চমী তিথিতে বিদ্যাদেবীর পূজার বিধান। স্মৃতিশাস্ত্র অনুসারে মাঘমাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমীতে পুষ্প, ধূপ, অন্ন ও জলাদি দ্বারা লক্ষ্মী, মস্যাধার (দোয়াত) ও লেখনীর (কলমের) পূজা করতে হবে। কিন্তু লেখা যাবে না। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী পূর্বাহ্নব্যাপিনী তিথিতে সরস্বতীর পূজারূপ উৎসব হবে। এই পঞ্চমী দুইদিন পূর্বাহ্নব্যাপিনী হলে, পূর্বদিনে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর পূজা হবে। তাতে আরও বলা হয়েছে– শ্রীপঞ্চম্যাং লিখেন্নৈব ন স্বাধ্যায়ং কদাচন। বাণীকোপমবাপ্নোতি লিখনে পঠনেহপি চ ॥ অর্থাৎ, শ্রীপঞ্চমীতে লেখা যাবে না, পড়া যাবে না; ঐ তিথিতে লেখাপড়া করলে সরস্বতীর বিরাগভাজন হতে হয়। বিদ্যার্থীগণ সবকিছু ছেড়ে তাই সরস্বতীর আরাধনায় মনোনিবেশ করেন।

দেবতারাও এই দেবীর সহায়তা লাভ করেছেন। শতপথ ব্রাহ্মণে (১২/৭/১/১১১২) আছে, ইন্দ্র একবার ব্রহ্মহত্যা করে সোমরস পানের অধিকার হারিয়ে শারীরিক ও মানসিক বল হারিয়ে ফেলেন। দেবতারা দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে অনুরোধ করলেন ইন্দ্রকে সারিয়ে দিতে। ইন্দ্র বললেন, আমাকে পশু উপহার (বলি) দিতে হবে। দেবতারা ছাগবলি দিতে রাজি হলেন। ছাগ হল কামের প্রতীক। সরস্বতীও ভিষক্ (চিকিৎসক)। দেবতারা তাঁকেও অনুরোধ করলেন ইন্দ্রকে সারিয়ে দিতে। সরস্বতী বললেন, আমাকে মেষ উপহার (বলি) দিতে হবে। মেষ হল মোহের প্রতীক। অশ্বিনীকুমারদ্বয় শারীরিক শক্তি দিয়ে এবং সরস্বতী বিদ্যা শক্তি দিয়ে ইন্দ্রকে সারিয়ে তুললেন। এজন্যই বলা হয় মেধাশক্তি বৃদ্ধির জন্য সুষম খাদ্য আহারে শারীরিক শক্তির যেমন দরকার, তেমনই দরকার কাম ও মোহ জয় অর্থাৎ সংযম বা ব্রহ্মচর্য। সত্ত্বগুণের বিকাশে এ সব শক্তি লাভ হয়।

যে মেধাশক্তির বলে মানুষ বিদ্যালাভ করে জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়, সেই মেধারূপে সকলের সত্তায় বিরাজ করছেন দেবী সরস্বতী। বুদ্ধি শুদ্ধ হলে এবং অন্তরে শ্রদ্ধা এলে তিনি জ্ঞানরূপে প্রকাশিত হয়ে মানুষকে কৃপা করেন। তাই তমোগুণ এবং রজোগুণকে অতিক্রম করে সত্ত্বগুণ লাভ করলেই বিদ্যাদেবীর আরাধনায় সফলতা আসবে। দেবী সরস্বতী বিদ্বানের জিহ্বায় বাস করেন। তাঁর বাক্যের মাধ্যমে বিদ্যার প্রকাশ হয়ে থাকে, অন্য ব্যক্তি বিদ্যা লাভ করেন। এজন্য বিদ্বান ব্যক্তি সমাজের সর্বত্র পূজা পেয়ে থাকেন। 'সা মে বসতু জিহ্বায়াং'– তিনি আমাদের জিহ্বায় বাস করুন, এই হল সকল সাধকের অন্তরের কামনা।

চাণক্য নীতিশাস্ত্রে আছে, 'আকাশমার্গে কোন লোক না পাঠিয়ে বিদ্বান মানুষ গণিতবিদ্যার সাহায্যে গ্রহণ সম্পর্কে বলে দিতে পারে। তার জন্য চন্দ্রসূর্যের কাছে লোক পাঠিয়ে জেনে আসতে হয় না। তাতে বোঝা যায় যে বিদ্যার কত শক্তি। তাই বিদ্বান ব্যক্তিকে কোন মানুষ সম্মান না করে থাকতে পারে না।' তাই বিদ্যাদেবীর জ্ঞানের কিরণে মানুষ সর্বত্র প্রতিপত্তি ও সম্মান লাভ করে। স্বামী বিবেকানন্দও ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত শিকাগো সম্মেলনে সরস্বতীকে স্মরণ করে বক্তৃতা শুরু করেছিলেন।

গীতায় (৪/৩৮) আছে, 'ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রম্ ইহ বিদ্যতে'– বিদ্যার সমান পবিত্র কিছু নেই। জ্ঞান পবিত্র, তাই পবিত্র অন্তরেই জ্ঞানলাভ হয়। প্রতিমায়ও দেখা যায় দেবী শুভ্র বসন পরেছেন। মাতৃভাব শুদ্ধভাব। মায়ের প্রতি সন্তানের ভালবাসা পবিত্র। এ ভালবাসায় দেবী সন্তুষ্ট হন। ছাত্রজীবন পবিত্র জীবন, তাই একে ব্রহ্মচর্যজীবন বলে। এ পবিত্রতা বুঝতে কবিগণ উপমা দিয়েছেন শ্বেত কুন্দপুষ্প, শুভ্র চন্দ্র, শুভ্র তুষার আর শুভ্র মুক্তার। তাই সরস্বতীর শ্বেত বসন, শ্বেত কুন্দপুষ্প তাঁর প্রিয়, তাঁর গায়ের রঙ তুষারধবল, তাঁর অলঙ্কার শুভ্র মুক্তার মালা। বাহন তাঁর শ্বেত হংস। সত্ত্বগুণের বিকাশেই অন্তরে জ্ঞানের প্রকাশ হয়। মাটির বা অন্য কোন প্রতিমায় পুষ্পচন্দনে বন্দনা করে দেবীর চিন্ময়ী বা জ্ঞানময়ী চরণ লাভের আকাঙ্ক্ষা বিদ্যার্থীর। তাঁর হাতের শ্বেত বীণার ঝঙ্কার ভক্তের অন্তরের ভয় দূর করে। এই বীণার ঝঙ্কার ও মধুর সুর জীবনবীণার তন্ত্রীতে ঝঙ্কার তুলে নিরানন্দ জীবন আনন্দে পূর্ণ করে তোলে। জ্ঞানচর্চায়ই এ আনন্দ লাভ হয়। শীত কাল জড়তায় আচ্ছন্ন। শীতের পর যেমন মধুর বসন্ত আসে, তেমনই জীবনে ভয় ও জড়তার বিনাশ ঘটিয়ে বিদ্যারূপিণী দেবী সরস্বতী জীবনকে জ্ঞানময়, ভক্তিময়, আনন্দময় বসন্তে নিয়ে যাবেন, এই প্রার্থনা।

ঋগ্বেদে (২/৪১/১৬) সরস্বতীকে শ্রেষ্ঠ মাতা, শ্রেষ্ঠ নদী ও শ্রেষ্ঠ দেবী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। 'অম্বিতমে নদীতমে দেবীতমে সরস্বতি।' সরস্বতী নদীর ধারে ঋষিগণ ধ্যান করে বেদের সত্য অনুভব করেছেন। সরস্বতীর সঙ্গে তাই জ্ঞানের সম্পর্ক। পুরাণেও সরস্বতী নদীর কাহিনি আছে। বামন পুরাণে আছে, ক্ষত্রিয় রাজা বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করতে চান। বশিষ্ঠ ঋষি তাঁকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করলেই তিনি ব্রাহ্মণ হবেন। কিন্তু বশিষ্ঠ তাঁকে স্বীকার করছেন না। কারণ বিশ্বামিত্রের দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ এসব কমছে না। সরস্বতীর তীরে বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভের সাধনা করছেন। তিনি সরস্বতীকে বললেন তাঁর বানের জলে ভাসিয়ে বশিষ্ঠকে বিশ্বামিত্রের কাছে নিয়ে আসতে হবে। সরস্বতী বুঝতে পারলেন বিশ্বামিত্র তাঁকে হত্যা করতে চান। তিনি পড়লেন উভয় সঙ্কটে। বশিষ্ঠকে সকলেই ভালবাসে, সম্মান করে। কি করে তাঁর মৃত্যুর কারণ হবেন সরস্বতী! আবার বিশ্বামিত্রের কথা না শুনলেও বিপদ, অভিশাপ দেবেন তিনি। এসব ভেবে বশিষ্ঠের কাছে গিয়ে সরস্বতী তাঁর সমস্যার কথা করলেন। বশিষ্ঠ বললেন, তপস্বী ঋষিদের কথা শুনতে হয়। সরস্বতী আশ্চর্য হলেন বশিষ্ঠের মহত্ত্ব দেখে। নিজের মৃত্যু জেনেও তাঁকে বিশ্বামিত্রের আদেশমত কাজ করতে বললেন। সরস্বতী নিজের জলে পাবন ঘটিয়ে বশিষ্ঠকে বিশ্বামিত্রের কাছে নিয়ে এলেন। বশিষ্ঠকে দেখে বিশ্বামিত্র বললেন, এবার কে বাঁচাবে তোমাকে আমার হাত থেকে? তিনি আশ্রম থেকে অস্ত্র আনতে গেলেন। এই সুযোগে সরস্বতীও বশিষ্ঠকে ভাসিয়ে অনেক দূরে নিয়ে গেলেন। সেখান থেকে এনে বশিষ্ঠকে হত্যা করা আর সম্ভব নয়। বিশ্বামিত্র রেগে গিয়ে অভিশাপ দিলেন। সরস্বতীর পবিত্র জল পুঁজর ক্তে পরিণত হল। তার তীরে বাস করতে লাগল ভূত-প্রেত, আর ঐ পুঁজর ক্তই খেতে লাগল তারা। বিশ যোজন দূর থেকে কয়েকজন তপস্বী সরস্বতী নদীতে স্নান করতে এসে সরস্বতীর এ অবস্থা দেখে দুঃখিত হলেন। শুনলেন তার এ অবস্থার কারণ হল বিশ্বামিত্রের অভিশাপ। তপস্বীরা অরুণা নদীর সঙ্গে সরস্বতীর যোগ করে দিলেন। ফলে সরস্বতী আবার আগের মত পবিত্র হয়ে গেলেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, বিশ্বামিত্র পরে ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন এবং বিখ্যাত গায়ত্রীমন্ত্রের দ্রষ্টাঋষিও তিনি।

দেবীর আরাধনা তথা বিদ্যার চর্চা জীবনে সর্বদা প্রয়োজন। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে, 'স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ' অর্থাৎ অধ্যয়নে কখনও উদাসীন হবে না। জ্ঞানরূপ আলোক দুঃখময় অজ্ঞান অন্ধকার দূর করে মানুষের অন্তর আনন্দে পূর্ণ করে। স্তবে তুষ্ট হলে দেবী সকল বিদ্যা দান করেন। তাই সঙ্গীতে, কলায়, স্তব-স্তুতিতে আর পুষ্পে দেবীকে অঞ্জলি দিতে হয়। 'সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।/বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোহস্তু তে ॥' অর্থাৎ হে মহাভাগ্যবতী, বিদ্যাস্বরূপা, কমললোচনা, বিশ্বরূপা, বিশালাক্ষী সরস্বতী, আমায় বিদ্যা দাও। তোমায় নমস্কার।

বিদ্যার দেবী সরস্বতী বিদ্যাদানে মানুষের মনকে আলোকিত করেন। শ্রদ্ধার উদয়েই বিদ্যালাভ হয়। জ্ঞানলাভ প্রসঙ্গে গীতা (৪/৩৯)য় বলা হয়েছে, 'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরো সংযতেন্দ্রিয়'– শিক্ষক বা গুরুজনের বাক্য পালন করে ইন্দ্রিয় সংযত করে শ্রদ্ধাবান হয়ে জ্ঞানলাভ করতে হয়। তাই বিদ্যার্থীদের প্রার্থনা, 'মেধে সরস্বতী বরে ভূতি বাভ্রবি তামসি। নিয়তে ত্বং প্রসীদেশে নারায়ণি নমোহস্তু তে ॥' –হে দেবী, তুমি মেধারূপা সরস্বতী, সর্বশ্রেষ্ঠা, সাত্ত্বিকী রাজসী তামসী ও দৈবশক্তিস্বরূপা, ঈশ্বরের শক্তি। তুমি প্রসন্না হও। হে নারায়ণী, তোমাকে প্রণাম।

স্বামী স্থিরাত্মানন্দ সহস ম্পাদক
রামকৃষ্ণ মিশন, ঢাকা

ছোটগল্প

চাঁদের দেশে

সুব্রত মণ্ডল

প্রত্যেক মানুষই কোনও না কোনও সময় আত্মহত্যার কথা ভাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত করে না। কথায় আছে, যারা আত্মহত্যার কথা বলে তারা কোনওদিনই করে না, কারণ তাদের সাহস নেই। যারা সত্যিই আত্মহত্যা করে তাদের মনের আয়নাটা যদি দেখা যেত? যদি দেখা যেত সে সময়টার ছবি? চোখে জল নেই, চিন্তায় ঢেউ নেই। হঠাৎই প্রিয় মানুষজন অন্য দেশের বাসিন্দা হয়ে যায়। বুকের অন্দরে তীব্র বালিঝড়। ভেসে আসছে হালকা হাওয়ায়– না, না, না। অস্তিত্ব হয়ে যায় পরমব্রহ্মের মত। ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না, আগুনে পোড়ে না, দেহ থাকে মন থাকে না। এ সব চিন্তা মোনালিসা করে না। তার কোনও ভয় নেই। কোনও দুঃখ নেই। এখনও পর্যন্ত পরীক্ষার উদ্বেগও নেই। কোনও বিরহ যন্ত্রণা নেই। বাবা-মার ভালবাসার খাঁচায় নিশ্চিন্ত পক্ষিণী।

এই সবে ক্লাস এইট। তার প্রথম আতঙ্কের পরিচয় রজঃদর্শনে। এখন নিজেকে একটু গুটিয়ে নিয়েছে। এমন কি তার প্রিয় বান্ধবী মা-এর কাছ থেকেও। এ জীবনের মানে ও লক্ষ্য সে বুঝতে পেরেছে। মাঝে মাঝে শরীরের উদ্দাম ঝড়ে দিশাহারা হয়ে যায়। গোপন মুহূর্তগুলো লুকিয়ে রাখে সবার অগোচরে।

রাতের বেলা। সারা গায়ে শিরশিরানি আসে। কতকগুলো পিঁপড়ে যেন পা বেয়ে ওঠে। তারপর থেমে যায়। তার শরীরে, বুকে, পেটে ঘুরঘুর করে। সে হাজার চেষ্টাতেও থামাতে পারে না এই শিরশিরানি। সে উলটে শোয়, পালটে শোয়। কিন্তু থামার কোনও লক্ষণ নেই। এটা গোপন কিছু হবে। বোধহয় সব মেয়েদেরই হয়। পা দুটো শক্ত হয়ে আসে।

তার একটা ছোট্ট নিজের ঘর আছে। বিশাল শূন্যে তার নিজস্ব পৃথিবী। বই, জামাকাপড়, চেয়ার, টেবিল, খাট। আর তুলতুলি। প্রিয় বিড়ালী। রাতের বেলা শুয়ে শুয়ে মহাশূন্যে সে ভাসে। মিথুন রাশি মিথুন লগ্ন। লগ্নচাঁদা মেয়ে। সে মায়ের কাছে শুনেছে। অত মানে বোঝে না। কিন্তু রাতের বেলায় চাঁদ দেখে। জানলায় বাইরে পূর্ণচন্দ্র। ডাকছে। আয় আয় তোর কপালে টি দিয়ে যাই।

চাঁদের পরে মা। মায়ের পরে তুলতুলি। তুলতুলির পরে মাস্টারমশাই। এরাই তার নিজের জন।

রাতের বেলা। সারা গায়ে শিরশিরানি আসে। কতকগুলো পিঁপড়ে যেন পা বেয়ে ওঠে। তারপর থেমে যায়। তার শরীরে, বুকে, পেটে ঘুরঘুর করে। সে হাজার চেষ্টাতেও থামাতে পারে না এই শিরশিরানি। সে উলটে শোয়, পালটে শোয়। কিন্তু থামার কোনও লক্ষণ নেই। এটা গোপন কিছু হবে। বোধহয় সব মেয়েদেরই হয়। পা দুটো শক্ত হয়ে আসে। হঠাৎ আলোর ঝলকানি আসে। হাজার হাজার সমুদ্রঢেউ আসে। সমুদ্রঢেউ তাকে ভিজিয়ে দেয়। কয়েক মুহূর্তের জন্য তার প্রিয় সখা চাঁদ এসে হাত ধরে। সে চাঁদের দেশে চলে যায়। লগ্নচাঁদা মেয়ে ভাবুক, সংবেদনশীল। বড় সহজে চোখে জল আসে, সে ঘুমিয়ে পড়ে।

মোনালিসার এখন ঘনঘন মন খারাপ করে। একা থাকতে ভাল লাগে। চিন্তা করে নির্জন দ্বীপের কথা। একটা ছোট্ট কুঁড়ে ঘর। তার আদরের তুলতুলি আর কেউ? সে এখনো ভাবতে পারে না, সে কে। সেই কুয়াশাচ্ছন্ন পুরুষের কথা। অথচ সে অনুভব করে তার আদর। ঠিক রাতের বেলা, যখন সে চাঁদের দেশে যায়। তার গোপন জগৎ।

সন্ধ্যে বেলা দু'এক ঘণ্টা সে ঘোরের মধ্যে থাকে। স্যার পড়াতে আসেন। অদ্ভুত রোমাঞ্চকর নানা রঙের খেলা। ভাল লাগা আছে, মজার কিছু অনুভূতি আছে। তার হাসি পায় স্যারের গোঁফদাড়ি দেখলে। ভাবে বৌদি সহ্য করে কী করে। হাঁচি পায় না? সে ফিকফিক করে হাসে। খেতে খেতে মা ধমক লাগান, এই হাসছিস কেন? সে মায়ের কানে কানে মজার কথা বলে। মা বলেন, চুপ অসভ্য মেয়ে।

বাবা ওপাশ থেকে বলেন, কী হল?

হল আবার কী, তোমার মেয়ের পাকামি।

মেয়ে চোখ পাকিয়ে বলে, বাবাকে একদম বলবে না।

স্যার চাকরি করেন। চোখ দুটো বড় সুন্দর। যখন সে পড়া পারে না স্যার বকেন। তার কিন্তু ভয় করে না। বড় বড় চোখ দুটো যেন আশ্বাস দেয়, ভয় পেয়ো না। বরং মনে হয়, সে যদি একটু জোরে কথা বলে স্যার তাঁর সুন্দর চোখ দুটো তুলে তাকাবেন অবাক বিস্ময়ে। যেমন চাঁদ জানলার ওপাশ থেকে তাকিয়ে থাকে। এটা মনের গভীরে তার আর এক গোপন কথা।

তার সারাদিনের রুটিনের মধ্যে ওর সবচেয়ে প্রিয় সময় দুটো। একটা সকালবেলা আদরের তুলতুলিকে দুধ খাওয়ান। আর একটা সন্ধ্যাবেলা স্যারকে রাগিয়ে দেওয়া।

সেদিন বেশ মজা হল, মা স্যারকে একবাটি পায়েস দিয়েছেন। স্যারও তুলতুলির মত চুকচুক করে বেশ খাচ্ছেন। দু'চার ফোঁটা লেগে যাচ্ছে পুরুষ্টু গোঁফে। মোনালিসা ফিকফিক করে হাসে।

স্যার রেগে যান, হাসছ কেন? পড়ায় মন নেই। তখন থেকে একটা অঙ্ক নিয়ে বসে আছ?

আপনার গোঁফ পেকে গেছে স্যার।

পেকে গেছে মানে?

ওইতো সাদা সাদা, আয়নাটা আনব?

চুপ, ডেঁপো মেয়ে।

মোনালিসার চোখ ছলছল করে। বলে, আমি বুঝি মিথ্যা কথা বলছি? এই দেখুন, বলে সে আঙুল দিয়ে পায়েসের দাগ তুলে দেয়।

স্যার আরও রেগে যান। দু হাত দিয়ে মোনালিসার হাতটা চেপে ধরেন। বলেন, পাজি মেয়ে, তোমার লেখাপড়া হবে না ছাই হবে। বছর বছর এক ক্লাসে থাকতে হবে।

মোনালিসা কপালে ঘন নিশ্বাস অনুভব করে। তার হাতদুটো কেউ যেন কেটে নিয়েছে, সে দ্বীপে বন্দি। জংলি মানুষের দল নাচছে বলম নিয়ে। সারা দেহ মোটা মোটা লতায় বাঁধা। আগুন জ্বলছে। অদ্ভুত ড্রামের শব্দ। যোদ্ধারা যেন ছুটে আসছে। হাতে ইস্পাত ফলা। শরীর অবশ। চোখের ওপর কড়া দাড়ির স্পর্শ আসছে। সারা শরীর জ্বলছে। সে আঁকড়ে ধরে। ঠোঁটের লালায় ভিজে যাচ্ছে সারা কপাল, সারা মুখ। যেন চাঁদের দেশে যাচ্ছে।

ওর এখন সবচেয়ে বড় চিন্তা, তুলতুলির বাচ্চা হবে। সে ছাদের ঘরে থাকে। বড় থলে পেতে দিয়েছে। দুধের সঙ্গে তার ভাগের মাছটাও এখন তুলতুলিকে খাওয়াচ্ছে। একদিন তুলতুলির পেটের ওপর মাথা রেখে শোনে ধুকুপুকু শব্দ। ওদের নাকি দু'চারটে বাচ্চা এক সঙ্গে হয়। সে একটার নাম ঠিক করেছে বুলবুলি। পরে ভেবে ভেবে আরো নাম ঠিক করবে।

তার এখন গোপন জগতের সংখ্যা বাড়ছে। প্রথম স্তরে আছে তুলতুলি আর স্যার। দ্বিতীয় স্তরে মা। একদম শেষে বাবা। মা তার প্রিয় বান্ধবী কিন্তু এখন যেন একটা পর্দা নেমে এসেছে। গোপনীয়তা আর অপরাধবোধ। এই পনেরো বছরে সে বুঝেছে কিছু কথা নিজের কাছে রাখাই ভাল। নিজের সঙ্গে অবিরাম যুদ্ধ করে কিন্তু সন্ধে হলেই যেন ছলনাময়ী হয়ে যায়। হাতে হাত রাখে। দু'এক মুহূর্তের জন্য গালে পালকের ছোঁয়া। ভয়ঙ্কর চাঁদের খেলা। দূর থেকে ভেসে আসে অস্পষ্ট ড্রামের শব্দ। পা শক্ত হয়ে আসে। শরীরে অহেতুক শিশিরবিন্দু। যেন সাপের চোখ তাকে নিয়ে যায় অন্য জগতে। যার বর্ণনা সে করতে

মোনালিসা কপালে ঘন নিশ্বাস অনুভব করে। তার হাতদুটো কেউ যেন কেটে নিয়েছে, সে দ্বীপে বন্দি। জংলি মানুষের দল নাচছে বলম নিয়ে। সারা দেহ মোটা মোটা লতায় বাঁধা। আগুন জ্বলছে। অদ্ভুত ড্রামের শব্দ। যোদ্ধারা যেন ছুটে আসছে। হাতে ইস্পাত ফলা। শরীর অবশ। চোখের ওপর কড়া দাড়ির স্পর্শ আসছে। সারা শরীর জ্বলছে। সে আঁকড়ে ধরে। ঠোঁটের লালায় ভিজে যাচ্ছে সারা কপাল, সারা মুখ। যেন চাঁদের দেশে যাচ্ছে।

তুলতুলি আসবে। সঙ্গে বুলবুলি, টুনটুনি, মৌসোনা আর চৌসোনা কিন্তু সে কোথায় গেল? তার কি হৃদয় বলে কিছু নেই, এত সহজে মোনালিসাকে ভুলে গেল। পৃথিবীর সব মা-ই কি সন্তানের জন্য সব ভুলে যায়? সেও ভুলে যাবে তুলতুলি, স্যার, মা, বাবা, ইসকুল! তার চিন্তায় ঠাণ্ডা স্রোতের সঙ্গে অজানা একটা আতঙ্ক। তারও যদি বাচ্চা আসে? শরীর হাড়হিম হয়ে আসে।

পারবে না। কিন্তু অনুভবে গুটিপোকা ঘোরে সারা দেহে। গুনগুন গুনগুন। দেহ আর্দ্র। সে বুঝতে পারে না এটা কী হচ্ছে। এর আয়ু কতক্ষণ? সে কী চায়? তার কী ভাল লাগে? হাঁ, ভাল লাগে। এই সময়টুকু। তারপর তুলতুলি, মা, বাবা, ইসকুল।

গত রবিবার মাবাবা সি নেমায় গিয়েছিলেন। সে স্যারের সঙ্গে মজার খেলা খেলেছে। সে বড় সুখের খেলা সে জানত না রক্তপাত এত মধুর। রাতের বেলা চাঁদকে ডেকে বলে, তুমি যে এত দুষ্টু জানতাম না।

পরের দিন আর এক কাণ্ড। তুলতুলি বেপাত্তা। সে ছাদের ঘরে গিয়ে দেখে তুলতুলি নেই।

সে অপেক্ষা করে কিন্তু তুলতুলি আসে না। সে তারস্বরে চিৎকার করে, মা তুলতুলি কোথায়?

কোথায় আমি জানব কী করে? দেখ কোথায় লুকিয়ে আছে।

আমি সারা বাড়ি খুঁজছি, পাচ্ছি না।

তাহলে কোথায় লুকিয়েছে। বাচ্চা হবে তো। দেখবি একসঙ্গে চার পাঁচজন আসবে।

তুলতুলি আসবে। সঙ্গে বুলবুলি, টুনটুনি, মৌসোনা আর চৌসোনা কিন্তু সে কোথায় গেল? তার কি হৃদয় বলে কিছু নেই, এত সহজে মোনালিসাকে ভুলে গেল। পৃথিবীর সব মাই কি স ন্তানের জন্য সব ভুলে যায়? সেও ভুলে যাবে তুলতুলি, স্যার, মা, বাবা, ইসকুল! তার চিন্তায় ঠাণ্ডা স্রোতের সঙ্গে অজানা একটা আতঙ্ক। তারও যদি বাচ্চা আসে? শরীর হাড়হিম হয়ে আসে। সে কী করে মা বাবা সমাজ ইসকুল সবার কথা ভুলে গেল? এত সহজে একজন বয়স্ক মানুষের কাছে ধরা দিল! তার মধ্যে কি লজ্জা অপমানবোধ কিছুই নেই? পুরো ব্যাপারটায় সেই দোষী। সেই আগে এগিয়ে গেছে। একটা ঘোরের মধ্যে। যেন একটা দানব তার মধ্যে ভর করে। অচেনা ঘোড়সওয়ার এসে তুলে নিয়ে যায়। সন্ধে থেকেই সে শোনে অশ্বখুরের আওয়াজ। অদ্ভুত আলো আঁধার। যদি কিছু হয়? সে কী করবে? বাবামা কে কী উত্তর দেবে?

রাতে খাবার টেবিলে বসে সে খাবার নিয়ে অহেতুক নাড়াচাড়া করে। মা লক্ষ্য করেন। বলেন, খাচ্ছিস না কেন?

মা আমি আর পড়ব না।

মা তীক্ষ্ণ গলায় বলেন, পড়ব না মানে?

এই স্যারের কাছে আর পড়ব না।

মা তার সংসারের অনেক ঝড়ঝাপটা সাম লে আজকের এই শান্তির নীড়টি গড়েছেন। তিনি তাঁর যুদ্ধক্লান্ত চোখ দিয়ে মেয়ের মুখের ভেতর যেন উত্তর খোঁজেন, তোকে বলতেই হবে কেন?

বললাম তো পড়ব না। স্যারকে আমার ভাল লাগে না।

ভাল লাগে না, হঠাৎ?

মোনালিসা চুপ করে থাকে। তার কাছে কোনও উত্তর নেই।

মা কিছুটা বুঝলেন বাকিটা রহস্যই রইল। তিনি স্যারকে না করে দিলেন। আজকের মোনালিসা আর গতকালের মোনালিসা এক নয়। সে এখন তার নিরাপত্তার ব্যাপারটা বুঝেছে। ভবিষ্যৎ বুঝেছে। সে বুঝেছে, এটার প্রয়োজন ছিল। এই মিথ্যাচারের। এটা না হলে তাকেও বোধহয় একদিন তুলতুলির মত নিরুদ্দেশ হতে হত। সে বোঝে না ভগবান কেন তাকে এমন করে গড়েছেন। শরীরে কেন এত উত্তাপ দিয়েছেন। স্কুলে এত মেয়ে পড়ে কেউ তো তার মত নয়। অক্লেশে মিথ্যে কথা বলে। এই পাপ ঈশ্বর সহ্য করেননি। তাই আজ তুলতুলি হারিয়ে গেছে। ওর নরম ছোঁয়া আর কোনদিনই পাবে না। মিথ্যার অনুরণন তাকে অস্থির করে তোলে সবসময়। পৃথিবীতে বোধহয় কিছু মনখারপের ব্যাপার আছে ভাইরাসের মত। রক্তে বয়ে চলে রক্তবীজ। মোনালিসা ছটফট করে। রাতের চাঁদ আর কাছে ডাকে না। পাপের ভাইরাস তাকে একটা পর্দা টেনে দিয়েছে। চিন্তার বিস্তার শুধু বদ্ধ জলায় ঘুরপাক খায়। হারিয়ে গেছে কয়েক মুহূর্তের রংমশালের আলো। তার প্রিয় নিজস্ব জগৎ। রাতে ঘুম হয় না। অসহ্য যন্ত্রণায় বিছানায় উঠে বসে।

সে আজ আবার ঋতু দেখেছে। মনটা হু হু করে ওঠে স্যারের জন্য। তুলতুলির জন্য। তার স্বার্থপরতা সীমাহীন। বুকটা কেমন করে। কিন্তু কান্না আসে না। আজ চাঁদ যেন নিতান্তই আলোর একটা থালা। ভূগোলের খাতায় আঁকা পরীক্ষার ছবি মাত্র।

সে নানা রকম যুক্তি খাড়া করে। সে বালিকা। অল্প বয়স। স্যারের তো উচিত ছিল সংযত হওয়া। মানুষের কী পরিচয়? দানব? তুলতুলি পালিয়েছে গর্ভস্থ সন্তানদের সুপ্রসবের জন্য। তার পাপে কী এসে যায়? বোকা বোকা চিন্তা। সে তার প্রিয় অঙ্গ স্পর্শ করে। হিমশীতল। শুধুই অঙ্গ। কোনও তাপ নেই। কোনও রহস্য নেই। শাপগ্রস্ত অহল্যা। হে ভগবান কী হল? প্রিয় চাঁদ তুমি কোথায় গেলে?

সে পা টিপে টিপে ছাদে আসে। আকাশ হিরে গাঁথা রেশমি শাড়ি। চাঁদও উঠেছে। ছাদের ধারে ধারে নারকেল গাছ। পাতাগুলো যেন কাটাকুটি খেলে। এ তার পরিচিত প্রিয়জন নয়। তার সঙ্গে চিরকালের আড়ি। শরীরের অদ্ভুত নেশা। সে চাঁদ দেখবেই। ভয় নেই। স্মৃতি নেই। ভবিষ্যতের ছবি নেই। সে ছাদের পাঁচিলে উঠে পড়ে। বাতাসে নারকেল পাতার লম্বা ছুরি আঁচড় কাটে গালে। প্রিয় বন্ধুর গায়ে আজ কীসের ছবি? চরকাবুড়ি না তুলতুলি? সে আজ দেখবেই। সে প্রশ্ন করে, তুমি কি এখনও আমার? তুমি কি এখনও রূপের মহিমা? সে কপালে চাঁদ দেখে। দু'হাত বাড়িয়ে দেয়।

মা কিছুটা বুঝলেন বাকিটা রহস্যই রইল। তিনি স্যারকে না করে দিলেন। আজকের মোনালিসা আর গতকালের মোনালিসা এক নয়। সে এখন তার নিরাপত্তার ব্যাপারটা বুঝেছে। ভবিষ্যৎ বুঝেছে। সে বুঝেছে, এটার প্রয়োজন ছিল। এই মিথ্যাচারের। এটা না হলে তাকেও বোধহয় একদিন তুলতুলির মত নিরুদ্দেশ হতে হত। সে বোঝে না ভগবান কেন তাকে এমন করে গড়েছেন। শরীরে কেন এত উত্তাপ দিয়েছেন।

সুব্রত মণ্ডল ভারতের ছোটগল্পকার

সৌহার্দ

শিক্ষা উন্নয়নে ভারত ভ্রমণ

ড. মো. আমিনুল হক ভূঁইয়া

ডিসেম্বর বিজয়ের মাস। এই মাসে বাংলাদেশের দু'টি দিন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য: একটি হচ্ছে– ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস এবং অপরটি ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস। ২০১৩ সালের ডিসেম্বর মাসের ১৪।১৯ তারি খে বাংলাদেশ থেকে আরো আটজন উপাচার্যের সঙ্গে আমার ভারত সরকারের বিদেশমন্ত্রকের আমন্ত্রণে ভারতের বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় এবং উল্লেখযোগ্য সরকারি পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা হওয়ার সুযোগ ঘটে। দিল্লি ও কলকাতার ওবেরয় হোটেলে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল।

যাত্রা শুরু হল এয়ার ইন্ডিয়ার এআই ২৩২ ফ্লাইটে সকাল পৌনে ১০টায়। পরদিন আগ্রার উদ্দেশ্যে আমরা ৯ জন উপাচার্য সাম্প্রতিক সংযোজিত দিল্লিআগ্রা এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে যাতায়াত করে রাতের বেলা দিল্লিতে ফিরে এলাম। দুপুরে আগ্রার ট্রাইডেন্ট হোটেলে লাঞ্চ সারলাম এবং তাজমহলের দৃষ্টিনন্দন সৌন্দর্য উপভোগ করলাম। আমাদের তাজমহল দেখবার বিশেষ ব্যবস্থা থাকায় তা অনেক সুবিধাজনক হল। অন্যথায় লোকে লোকারণ্য তাজমহল প্রাঙ্গণে আমাদের অনেক সময় লেগে যেত। দিনে দিনে ভ্রমণপিপাসু মানুষের সংখ্যা তাজমহলে বেড়ে গেছে বলে আমার কাছে মনে হল।

পরদিন আমাদের বিজয় দিবসে দিল্লি আইটি পার্কে ন্যাশনাল নলেজ নেটওয়ার্কের কার্যক্রম দেখার সুযোগ হল এবং বিভিন্ন রাজ্য, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল ইত্যাদির সঙ্গে চলমান ন্যাশনাল নলেজ নেটওয়ার্ক্সএর যোগসূত্রের কার্যকরণ বুঝানো হল। এই দিনেই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের একটি উপস্থাপনায় আমরা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হলাম। এদিন দুপুরে ভারতের বিদেশ সচিব সুজাতা সিংয়ের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজে অংশগ্রহণ করলাম এবং একইদিনে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ মন্ত্রী ড. এম মঙ্গপতি পাল্লাম রাজু এবং ইউজিসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক বেদ প্রকাশের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। সৌহার্দমূলক এই আলোচনায় দু'দেশের মধ্যে পারস্পরিক উচ্চশিক্ষা উন্নয়ন সংক্রান্ত যৌথ কার্যক্রমের বিষয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হল। দু'জনেই খুব সজ্জন ও বিদ্বান ব্যক্তি।

হরিয়ানায় ও পি জিন্দাল গেস্নাবাল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. রাজকুমারসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকম-লী আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম শুরুর বিষয়ে বিশদ আলোচনা করলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে উত্তোলিত ভারতীয় পতাকাটি অনেক বড় এবং পৎ পৎ করে উড়তে দেখলাম। ওঁদের মতে, এটিই ভারতের 'সর্ববৃহৎ' পতাকা।

পরদিন দিল্লির আরাবল্লি রেঞ্জের এক হাজার একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে গেলাম। বিশ্ববিদ্যালয়টি ১৯৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সুধীর কুমার সপোরিসহ বিভিন্ন ফ্যাকাল্টির ডিনদের সঙ্গে আমাদের পারস্পরিক যোগাযোগ, বিশেষ করে নতুন ফ্যাকাল্টি বিনিময়ের বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা হয়। এরপর আমাদের সঙ্গে সাউথ ব্লকে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী সালমান খুরশিদ। সন্ধ্যায় ভারতের বিশিষ্টজনদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। পরদিন বিকেলে ইন্দিরা গান্ধী ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে কলকাতায় আসার পূর্বে হরিয়ানায় ও পি জিন্দাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. রাজকুমারসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলী আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম শুরুর বিষয়ে বিশদ আলোচনা করলেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে উত্তোলিত ভারতীয় পতাকাটি অনেক বড় এবং পৎ পৎ করে উড়তে দেখলাম। ওঁদের মতে, এটিই ভারতের 'সর্ববৃহৎ' পতাকা।

এই সফরসূচির সর্বশেষ দিনে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট (আইআইএম) দেখার সুযোগ হল। একশো পঁয়ত্রিশ একর জমির উপরে পশ্চিমবঙ্গে স্থাপিত এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা অনেকাংশে আমাদের ব্যবসায় প্রশাসন সংক্রান্ত পাঠ্যক্রমের অনুরূপ। আইআইএমএর স ঙ্গে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সহযোগিতামূলক ফ্যাকাল্টি বিনিময়ের সুযোগ রয়েছে।

এই সফরে বুয়েটের অধ্যাপক এস এম নজরুল ইসলাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মো. মিজানউদ্দীন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মো. আনোয়ারুল আজিম আরিফ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আইনুন নিশাত, স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশএর অধ্যাপক ইফতেখার গণি চৌধুরী, সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন, ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ওমর রহমান, ইউনিভার্সিটি অফ লিবারেল আর্টস, বাংলাদেশএর অধ্যাপক ইমরান রহমান এবং ব্যক্তিগতভাবে আমি যে আন্তরিকতা, আতিথেয়তা ও সহযোগিতা পেয়েছি তা মনে রাখার মত। এ ধরনের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল ভারত সফর করলে এবং ভারত থেকেও অনুরূপ প্রতিনিধিদল বাংলাদেশে আসার সুযোগ পেলে আমাদের দু'দেশের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে আরও সম্পৃক্ততা বাড়বে ও উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এ ধরনের সৌহার্দমূলক সফরের ফলে ভবিষ্যতে দু'দেশের মধ্যে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা উন্নয়ন কার্যক্রম আরও বেগবান হবে বলে আমি মনে করি। ১৯ ডিসেম্বর রাতে এয়ার ইন্ডিয়ার এআই ২৩০ ফ্লাইটে আমরা সবাই ঢাকা পৌঁছলাম।

স্বদেশের মাটির প্রতি মমত্ববোধ এবং আকর্ষণ সবসময়ই অন্যরকম। বাংলাদেশ শত প্রতিকূলতার মধ্যেও সামনে এগিয়ে যাক– এই আমাদের সব সময়ের কামনা।

প্রফেসর ড. মো. আমিনুল হক ভূঁইয়া উপাচার্য
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট

ঘটনাপঞ্জি ❖ ফেব্রুয়ারি

কবি জীবনানন্দ দাশ

০৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩ ❖ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের জন্ম
০৪ ফেব্রুয়ারি ১৯২২ ❖ ধ্রুপদী গায়ক পণ্ডিত ভীমসেন যোশীর জন্ম
০৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬ ❖ ঋত্বিক ঘটকের মৃত্যু
০৭ ফেব্রুয়ারি ১৯০৪ ❖ শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের জন্ম
১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৭ ❖ কবি নবীনচন্দ্র সেনের জন্ম
১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৮২ ❖ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের জন্ম
১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৯ ❖ সরোজিনী নাইডুর জন্ম
১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯১৯ ❖ কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম
১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১ ❖ গৌরী আইয়ুবের জন্ম
১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯১৬ ❖ লে. জে. জগজিৎ সিং অরোরার জন্ম
১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪ ❖ দাদাসাহেব ফালকের মৃত্যু
১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯ ❖ কবি জীবনানন্দ দাশের জন্ম
১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬ ❖ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের জন্ম
২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ ❖ বাংলা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে প্রাণ বিসর্জন
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
২২ ফেব্রুয়ারি ১৯০৬ ❖ সাহিত্যিক হুমায়ুন কবিরের জন্ম
২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪ ❖ কস্তুরবা গান্ধীর মৃত্যু
২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯০৮ ❖ লীলা মজুমদারের জন্ম
২৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৬১ ❖ কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত (পূর্ববঙ্গের প্রথম আইসিএস)র জন্ম

ধারাবাহিক উপন্যাস

নিঃসঙ্গ মানুষের কলমুখর সময়

সেলিনা হোসেন

(পূর্ব প্রকাশিত-র পর)

সকালবেলা ঘুম ভাঙে না শিউলির।

কত রাত পর্যন্ত কেঁদেছে জানে না। বাড়িতে কোন ঘড়ি নেই। যদি থাকত, তাহলেও কুপি জ্বালিয়ে ঘড়ি দেখার আগ্রহ ওর থাকত না। এক ঘোরের ভেতরে কেমন করে যেন রাতের সময় চলে গেছে। ওর ঘুম আসে আযানের সময়। আযানের ধ্বনি শুনতে পাচ্ছে, এমন এক চৈতন্যরহিত অবস্থায় ও ঘুমের ভেতর তলিয়ে যায়। এই মুহূর্তে শ্বাসপ্র-শ্বাস প্রবাহের ভেতরে এক নিঃসাড় অবস্থায় আছে।

বকুল বিছানার উপর বসে প্রথমেই শিউলির দিকে তাকায়। ওর নিঃসাড় ঘুম দেখে ভুরু কুঁচকে রাখে। ওর নিজের ঘুম ভেঙেছে বেশ প্রসন্ন চিত্তে। ভাবে, রাত খুব ভালই কেটেছে। সুন্দর স্বপ্ন দেখেছে। মাঝ রাতে ঘুম ভাঙেনি। মশার কামড় টের পায়নি। আসলে ওর জীবনের সুখের পাল্লা ভারী হয়েছে। সোহেল ওকে ভালবাসার কথা বলেছে। দু'জনে একসঙ্গে দুবাইয়ে কাজ করতে যাবে এমন স্বপ্ন দেখিয়েছে। শিউলির দিকে তাকিয়ে বুক ভার লাগে। ভাবে, বিশেষ বয়সে প্রেমে না পড়লে

দিন এবং রাত কুঁকড়ে যায়। সব কাজই সময়মত হওয়া চাই। শিউলির ঘুম যদি আজ রাতে না ভাঙে তাহলে ভালবাসাহীন জীবনের মৃত্যু ওদের সবাইকে কাঁদাবে। আল্লাহ না করুক, শিউলির ঘুম নিশ্চয়ই ভাঙবে! বকুল নিঃশব্দে বিছানা ছাড়ে। হাতমুখ ধুয়ে রান্নাঘরে যায়। চুলো থেকে ছাই তুলে চুলো পরিষ্কার করে। রাতের বাসনকোসন নিয়ে ধুতে বসে রান্নাঘরের পেছনে। সব বোনেরা মিলে একটি জায়গা পরিষ্কার করে নিয়েছে থাল্মবাসন ধোয়ার জন্য। দুটো বালতিভরা পানি রাখা হয়। বালতির পানি ভরে রাখার দায়িত্ব চম্পার। কখনো ও কাজটি করতে ভুলে যায় না। বকুল একদিন হাসতে হাসতে বলেছিল, তুই এমন বাপের মেয়ে হলি কি করে রে চম্পা? বালতি ভরতে কখনো ভুলে যাস না?

ভুলব কেন? তোমরা আমাকে কাজটি করতে বলেছ, আমি করে যাই। ইয়ার্কিমারা কথা কিন্তু আমার সহ্য হয় না বকুল বুবু!

ইয়ার্কি করিনি। কাজের মেয়েকে প্রশংসা করেছি।

হয়েছে রাখ। চম্পা মুখ ঝামটা দিয়েছিল।

থাল্মবাসন সাম নে নিয়ে একটু চুপ করে বসে থেকে বকুল ভাবে, সোহেল কি কখনো ওকে এমন করে মুখ ঝামটা দিয়ে কথা বলবে? হয়তো বলবে। একসময় ভালবাসার কথা বলার দিন ফুরিয়ে যাবে। একসময় ঝগড়া হবে, মারপিটও হতে পারে– নাকি মেরেও ফেলতে পারে! বকুল এঁটো বাসন্ন কোসনের উপর হাত রেখে শিউরে ওঠে। ওর বাবারওতো এমন ভালবাসার দিন ছিল, তারপর কেমন করে কি হয়ে গেল। বাব্মা য়ের মধুর জীবনের সঞ্চয় শেষ। এখন দু'জনের হাত শূন্য কড়িতে ন্যাড়া। বকুল প্রচ- মন খারাপ নিয়ে বাসন্ন কোসন ধোবার কাজ শুরু করে। চোখে পানিও আসে। ভাবে, নতুন চলা শুরু হল। উঠোন থেকে অন্যদের কথা ভেসে আসছে। পদ্ম স্কুলে যাবে। ওর তাড়াহুড়ো আছে। চম্পার হাসির শব্দ শোনা যায়। হাস্নুহেনাও কি যেন বলছে। সব মিলিয়ে ভোরের পাখির কলরবের মত সকালটা মনে হলেও নিজের ভারটা কমে না বকুলের। ভালবাসার কথা একদিন শেষ হবে!

ও বাসন্ন কোসন নিয়ে ফিরে এসে উঠোনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, এত হাসাহাসি কেন? ঘুম ভাঙতেই মুখে হাসি আসে?

আসবে না কেন? হাসির তো ম্মাবাপ নাই। বকা খাওয়ার ভয়ও নাই।

হাসছিলি কেন তাই বল।

শিউলি বুবু মরার মত ঘুমাচ্ছে।

কথা বলা শেষ করেই আবার হিহি হাসির রোল ওঠে।

চম্পা বলে, মানুষ যে মরার মত ঘুমায় এই প্রথম দেখলাম।

বকুল ধমক দিয়ে বলে, তাতে হয়েছে কি? তোরা কি বুবু মরে গেলে খুশি হবি?

ছি, ছি, আমরা তাই বলেছি নাকি। বকুল বুবু তুমি না এমন করে কথা বল!

বকুল ওদের দিকে না তাকিয়ে রান্নাঘরে চলে যায়। ওদের হাসি তখনো থামেনি। ওরা হাসতেই থাকে। বাসন্ন কোসন রাখার জন্য পিঁড়ির উপর বসলে ওর মাথা হাঁটুর উপর নেমে আসে। ও নিজেকে কিছুতেই সামলাতে পারে না। কাঁদতে শুরু করে। সোহেলের ভালবাসায় নানা পোকা এবং পোকার বিষাক্ত কামড় যেন ওকে জ্বালিয়ে মারে। যে প্রসন্ন মন নিয়ে ঘুম ভেঙেছিল সেই মনের অবস্থা কত তাড়াতাড়ি বদলে গেল। হায় নিষ্ঠুর দুনিয়া! ওর কান্নার শব্দ শুনে তিন বোন রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়ায়। মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করে, কি হয়েছে বুবু? আমরা কি কিছু করেছি?

বকুল কাঁদতেই থাকে। ওদের দিকে মুখ ফেরায় না। হাস্নুহেনা বলে, থাক, আমরা আর কথা বলব না। বকুল বুবুর বোধহয় মায়ের কথা মনে হয়েছে সেজন্য কাঁদছে।

তিনজন ফিরে আসে ঘরের বারান্দায়। পদ্ম বলে, তুমি আমাকে পান্তা ভাত দাও হাস্নু বুবু। আমি স্কুলে যাই।

মনে আছে, কাল রাতে রান্না হয়নি। আমরা দুধভাত খেয়েছি।

বলতে তো পান্তা আছে, কিন্তু কোন তরকারি নাই।

হ্যাঁ সেটাই বলতে চেয়েছিলাম। তার আগে তুই আমাকে ঝাড়ি দিয়ে দিলি।

এটা কোন রাগের ঝাড়ি না। সত্য কথার ঝাড়ি।

ওরে আমার সত্যবতী! কোন ফিতা দিয়ে চুল বাঁধবি? আয় বেঁধে দেই।

লাল্সবুজ ফিতা দি য়ে চুলের বেণী ঝুলিয়ে দাও।

যা নিয়ে আয়।

পদ্ম ঘরে ঢুকে দেখে বিছানার উপর বসে আছে শিউলি। চেহারায় বিরক্তি আর কান্না যেন জমে আছে। চুল উস্কুখুস্কু। খোঁপা করেনি। পিঠের ওপর ছড়িয়ে আছে। শাড়িও গায়ের ওপর ঠিক নাই। পদ্ম কাছে গিয়ে বলে, কি হয়েছে?

তুই রেডি হোসনি কেন?

এখন চুলের বেণী করব। তারপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পান্তা খাব। তারপর একদৌড়ে সবার আগে স্কুলে পৌঁছে যাব। আমার আগে কেউ পৌঁছতে পারবে না বুবু। তুমি যাবে না স্কুলে?

যাব। শুধু কাপড় বদলাব। তারপর ছাতা আর ব্যাগ নিয়ে রওনা করব।

পদ্ম হাসতে হাসতে বলে, তুমি তো আমার মত দৌড়তে পারবে না। তুমি না হেড মিস্ট্রেস!

ও তাক থেকে চুলের ফিতা নিয়ে বেরিয়ে যায়। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকায়। দেখতে পায় শিউলি কাঁথ্মব ালিশ গুছিয়ে রাখছে। হঠাৎ ওর মনে হয় আজকে বকুল বুবুরও যেন কি হয়েছে। তার মনেও দুঃখ। পদ্ম কাছে এসে দাঁড়ালে হাস্নুহেনা ওর চুলে হাত দেয়। সিঁথি করে। সমান করে আঁচড়ে বেণী করে। তখন ঘর থেকে বেরিয়ে আসে জয়নুল মিয়া। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আড়িমুড়ি ভেঙে বলে, তোরা কি করিস রে?

স্কুলে যাওয়ার তোড়জোড় করি বাজান।

শিউলি চলে গেছে?

না, যাবে। বিছানা গোছাচ্ছে।

বিছানাটা তোরা গোছাতে পারিস না?

কেন হেড মিস্ট্রেস হলে বিছানা গোছানোর কাজ করতে হয় না বাজান?

এই বুঝলি তোরা!

জয়নুল মিয়া বিরক্ত হয়ে উঠোনে নেমে যায়। রান্নাঘরে বকুল মরিচ পোড়াচ্ছে। মরিচের ঝাঁঝাল গন্ধ গড়াচ্ছে চারদিকে। জয়নুলের মনে হয় বাতাস্মোটি তে সবখানে পোড়া মরিচের গন্ধ আজ ওর মাথায় ঘূর্ণি উঠিয়েছে। ও নিঃশব্দে বাইরে চলে আসে। ভাবে, আজ সারাদিন ধানখেতে কাজ করবে। দুপুরে খেতেও আসবে না বাড়িতে। আজ ওর কাজের দিন। সোনালি ধান্নকাটার দিন। কি ন্তু সকাল তেমন ফোটেনি। ও একজন উদভ্রান্ত মানুষের মত দিক ভুলে মাঠের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। সঙ্গে যাচ্ছে পাকা ধান। বলছে, জয়নুল মিয়া কোথায় যাও?

মামার বাড়ি কতদূরে?

পদ্মপুকুরপাড়ে। পুকুরে সোনালি মাছ আছে। সোনার সুতোয় বানানো জালে সেই মাছ ধরব।

ভেসে আসে বয়াতীর কণ্ঠ– পরান গেল পাখি আমার রে– ও পাখি– কতদূরে যাবি–

জয়নুল ফিরে দাঁড়ায়। ওর মনে হয় বয়াতীর গান শুনে ওর ভেতরের ঘোর কেটে যাচ্ছে। আসলে রাতে রাশিদুনকে স্বপ্ন দেখার পর ওর ভেতরটা ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। ও রাশিদুনকে বলেছিল, আমার কথা কি তোমার একটুও মনে পড়ে না শিউলির মা। কেমন করে আমাকে ভুলে গেলে। রাশিদুন মাছ কাটার বঁটি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। বলেছিল, তুমি একটা হারামী। তুমি কেমন করে তালাকের কথা বললে আমি তোমাকে কোনদিন মাফ করব না।

জয়নুল ধানখেতের আল ধরে হেঁটে আসতে আসতে বলে, তবে আমাকে কে মাফ করবে শিউলির মা? তুমি মাফ না করলে আমার দোজখেও জায়গা হবে না। তোমার দোহাই লাগে শিউলির মা– কি দোহাই লাগে? জয়নুল চারদিকে তাকায়। দেখতে পায় গান গাইতে গাইতে অনেক দূরে চলে গেছে বয়াতী। এই ভোরবেলায় ও কোথায় যাচ্ছে? কি দরকার আর একজনের পথচলা খুঁজে দেখা? যে যার মত চলুক। চলতে চলতে শেষ করুক জীবনের শেষ দিন। এই এখন যেমন জয়নুল মিয়াকে একা একা দিন শেষ করতে হচ্ছে।

পাশ দিয়ে সাঁই করে ছুটে যায় চম্পা ও পদ্ম। ওরা দু'জনে স্কুলে যাচ্ছে। বাবার দিকে তাকায় না। ভাবটা এমন যে একজন মানুষ পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকলে কিছ্বিা এ সে যায়। ওদের ছুটতে হবে। তাই ওরা ছুটছে। এক সময় জয়নুল মিয়ার চোখের আড়ালে চলে যায় ওরা। বিষণ্ন হয়ে জয়নুল বাড়িতে ঢোকে। ছুটে আসে হাস্নুহেনা, বাজান আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?

খেতে গিয়েছিলাম। পাকা ধানের শীষ নাড়িয়ে ধানের অবস্থা দেখে এসেছি। কাটার সময় হয়েছে তো।

আপনি কার দিকে তাকিয়ে কথা বলছেন?

এই উঠোনের দিকে তাকিয়ে। আর কয়দিন পরে এই উঠোনের কোণায় ধানের স্তুপ বোঝাই হবে।

ধান সেদ্ধ হবে। মাড়াই হবে। তারপরে ধানভানার কলে যাবে। তখন বকুল বুবুর দুবাই যাওয়ার সময় হবে। বুবু আর লাঠি হাতে ধান পাহারা দেবে না। আমি তখন কি করব বাজান? একা একা আমার খুব কান্না পাবে।

মাগো তুমি কার সঙ্গে কথা বলছ?

এই উঠোনের সঙ্গে।

ধানকাটার সময় হলে তোমার দাদী এই উঠোনের সঙ্গে কথা বলত। ধান কাটার সময় হলে তোমার মাও এই উঠানের সঙ্গে কথা বলত।

এখন আমরা কথা বলি। দাদী যখন কথা বলছেন তখন দাদীর সংসার ছিল। আমার মায়েরও সংসার ছিল। আমাদের পাঁচ বোনের সংসার নাই। তারপরও আমাদের উঠোনের সঙ্গে কথা বলতে হয়।

আমাদের নসীবে বৈশাখী ঝড়।

আমি যাই।

জয়নুল মিয়া আবার বাড়ির বাইরে যায়। ভাবে, দেখা হলে ওসমানকে বলবে, এ বছরে ওর খেতের ধান ও নিজে আর কাটবে না। লোক দিয়ে কাটিয়ে দেবে ওসমান। সেখান থেকে ধান চাল কলের চাতালে যাবে। এই উঠোন আর ধান দিয়ে ভরে উঠবে না।

জয়নুল মিয়া পা টেনে টেনে হাঁটে। কবে যেন পায়ে ব্যথা পেয়েছিল এখন আর মনে পড়ছে না। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পা প্রথমে ঝাঁকিয়ে নেয়, পরে ব্যথা পাওয়া জায়গাটা টিপে ব্যথার পরিমাণ আন্দাজ করে নেয়। বুঝতে পারে কাবু করে ফেলার মত ব্যথা নয়। অপর দিক থেকে হনহনিয়ে হেঁটে আসা তাজুল মিয়া ওর কাছে দাঁড়িয়ে বলে, কি হয়েছে আপনার?

কিছু না। আপনি আপনার পথে যান।

কথা বললেই আপনি এমন তিড়িংবিড়িং করেন কেন? ভালভাবে কথা বলতে পারেন না?

না, পারি না। আপনার সঙ্গে পারি না। আপনি ঘরে বউ রেখে আমার শিউলির দিকে চোখ দেন। আপনার লজ্জা করে না?

লজ্জা আবার কিসের? বিয়ে করতে চেয়েছি। রক্ষিতা রাখতে চাইনি। ভাতকাপড় দিতে পারব।

আর একবার এই কথা বললে জিহ্বা টেনে ছিঁড়ে ফেলব।

বাপের মুরোদ তো পাইপয়সা নাই। মেয়েগুলোকে দিয়ে ঘরের খুঁটি বানিয়েছেন। মেয়েদের ঘাড়ে বসে ভাতখাওয়া –

তবে রে শুয়োরের বাচ্চা–

ছোট একটি ইটের টুকরো কুড়িয়ে ছুঁড়ে মারার জন্য তৈরি হতেই তাজুল মিয়া নিজেকে ছাতা খুলে আড়াল করে এবং দ্রুতপায়ে এগিয়ে যায়।

স্কুলে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে বাড়ি থেকে বের হয় শিউলি। খানিকটুকু এগোতেই বাবাকে পথের ধারে বসে থাকতে দেখে দৌড়ে কাছে যায়। হাত ধরে টেনে তোলে।

কি হয়েছে বাজান?

শুয়োরের বাচ্চা তাজুল বলে আমি মেয়েদের ঘরের খুঁটি বানিয়েছি।

ও শয়তানটাকে পেলে আমি ওকে বঁটি দিয়ে জবাই দেব। আপনি দুঃখ পাবেন না বাজান। বাড়ি যান। বকুল আপনার পান্তা বেড়েছে।

জয়নুল মিয়া এদিকওদিক তাকায়। ভা বে, কোন বাড়িতে যাবে? যেখানে মেয়েরা ঘরের খুঁটি?

বাজান, চলেন আপনাকে বাড়িতে রেখে আসি।

তুমি স্কুলে যাও মা। তুমি স্কুলের হেড মাস্টারনি। তোমার দেরি হওয়া ঠিক হবে না। মাগো তুমি যাও। আমি বাড়ি যাচ্ছি।

জয়নুল মিয়া বাড়িতে আসার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় বাড়ির উঠোন্নেঘ রে পোড়া মরিচের গন্ধ ভরেই আছে। কোথাও থেকে গন্ধ সরেনি। জয়নুল মিয়ার মনে হয় বুক ভরে শ্বাস টানতে পারছে না। বুক জ্বলে যাচ্ছে।

রান্নাঘর থেকে থাল্লভর্তি ভাত নিয়ে বকুল কাছে এসে বলে, বাজান বারান্দায় আসেন। মাদুর বিছিয়ে রেখেছি।

মাগো ভাত খেতে তো মন চায় না।

শরীর ভাল নাই।

জয়নুল নিজের হাত কপালে দিয়ে বলে, জ্বর আছে তো মনে হয় না। আমার মনে হয় দুনিয়ায় যত অসুখ আছে তার সব এখন আমার শরীরে ঢুকছে। বলছে, জয়নুল মিয়া তোমাকে ভাল থাকতে দিব না।

বাজান আপনি যে কিসব কথা বলেন? এমন করে ভাবলে আপনি পাগল হয়ে যাবেন। আপনি আমাদের বটগাছ। আপনার ছায়া না হলে আমরা তো বাঁচব না। আসেন ভাত খান।

পোড়া মরিচের গন্ধে বুক জ্বলে যায়।

মরিচ তো সেই কখন পুড়িয়েছি। এখন গন্ধ নাই। এই যে আমি শ্বাস টানছি। কই গন্ধতো পাই না।

আমি তো গন্ধ পাই। শ্বাস টানতে পারি না।

উঠোনের ওপর দিক থেকে ছুটে আসে হাস্নুহেনা। বাবার হাত ধরে বলে, আপনাকে আজকে এক জায়গায় নিয়ে যাব। শুধু আপনি আর আমি যাব। বকুল বুবু যাবে না।

কোথায় যাবি রে?

হাস্নুহেনা বাবার দু'হাত ধরে বলে, বাবাকে নিয়ে সেই বটগাছের নিচে বসিয়ে দেব।

কোন বটগাছ?

যে বটগাছের কাছে আমার মা থাকে। ওখানে বাজানকে বসিয়ে রেখে আমি মাকে দেখতে যাব। তারপর বাজানকে নিয়ে আবার বাড়িতে ফিরে আসব। বেশি সময় লাগবে না বকুল বুবু।

তুই কি বলিস? যত্তসব কাজে কথা।

না, মোটেই বাজে কথা না। পোড়া মরিচের গন্ধ তো বাজানের বুকের মধ্যে। বাজানের শ্বাসেও পোড়া মরিচের গন্ধ। ওই বটগাছের নিচে কতক্ষণ বসলে বাজানের শরীর থেকে পোড়া মরিচের গন্ধ বেরিয়ে যাবে।

জয়নুল মিয়া হাঁ করে মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। মনে মনে ভাবে, মেয়েটা বোধহয় ঠিকই বলেছে। রাতে স্বপ্ন দেখার পর থেকেই তো এমন লাগছে। বাবাকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে দেখে বকুল বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যায়। অবাক হয়ে বলে, বাজান।

হাস্নুহেনার সঙ্গে আমি যাব মাগো।

যাবেন? বকুলের বিস্ময় কাটে না।

জয়নুল মিয়া ঘাড় নেড়ে মৃদুস্বরে বলে, যাব।

বকুল এবার চেঁচিয়ে বলে, যাবেন?

জয়নুল মিয়া মুখে কিছু বলে না শুধু ঘাড় কাত করে।

আপনি না বলেছিলেন, আজকে ধান কাটবেন।

কাটব। ওই বটগাছের নিচ থেকে ফিরে এসে কাটব।

তাহলে ভাত খান বাজান।

বকুল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। ওর বুকের ভেতর হালকা হয়ে যায়। ভাবে, শেষ পর্যন্ত মানুষের জন্য মানুষের ভালবাসা টিকে থাকে। মাঝে যত ঘটনাই ঘটুক না কেন। সারা সকাল নিজের ভেতরে যে যন্ত্রণা ছিল সেটা মুহূর্তে হাওয়া হয়ে যায়। বকুলের ভেতরে প্রসন্ন ভোর স্থির হয়ে গেলে ও দ্রুত বাবার দিকে তাকায়। ওর বাবা খুব শান্ত চিত্তে পান্তাভাত খাচ্ছে। একজন ধ্যানী মানুষই মনে হচ্ছে তাকে। ওর দুঃখ হয় এমন প্রশান্ত মনে ভাত খাওয়ার সময় ওর বাবাকে যদি এক টুকরো ইলিশ মাছ দেওয়া যেত! নেই। একটা ডিমও ঘরে নেই। ও বাবার জন্য গ্লাস ভরে পানি নিয়ে আসে। দেখতে পায় হাস্নুহেনা বেণী করে চুলের মাথায় লাল আর হলুদ ফিতা দিয়ে চমৎকার ফুল ফুটিয়েছে। বকুল খুশি হয়ে ভাবে, আজকের দিন ওর একলার। নিশ্চয় সুযোগ বুঝে সোহেল আসবে। এসে বলবে, তুমি আমার সামনে হাত পাত বকুল। ও দু'হাত পেতে দাঁড়ালে সোহেল একমুঠি বকুল ফুল দিয়ে বলবে, এগুলো শুধু গাছের বকুল না। আমাদের ভালবাসার ফুল। শুকিয়ে গেলেও ফেলে দিও না। কৌটায় ভরে রেখে দিও। বিয়ের পরে আমরা এই ফুল দিয়ে নতুন করে মালা গাঁথব।

মাগো পানি দাও।

বাজানের ডাকে ও নিজের ভেতর ফিরে আসে। বাবার সামনে গ্লাস এগিয়ে দেয়। ওকে দেখে জয়নুল মিয়া কিছু একটা আন্দাজ করে বলে, তোমাকে খুব খুশি খুশি দেখাচ্ছে মা।

আপনি যে আম্মার কাছে যাবেন, সেজন্য খুশি লাগছে।

ও তাইতো, তাইতো।

জয়নুল মিয়া গ্লাসের পানি দিয়ে বাসনে হাত ধুয়ে নেয়। ঘাড়ের ওপর রাখা গামছা দিয়ে মুখ মোছে। ভাবে, মেয়েগুলো না থাকলে বেঁচে থাকা অনেক কষ্টের হত। সুন্দর একটি জামা পরে হাস্নুহেনা আসে। হাতে বাবার জন্য একটা ফতুয়া। বলে, গায়েরটা খুলে এইটা পরেন। বকুল বুবু আপনার জামাটা ধুয়ে দিবে। ময়লা হয়েছে। জয়নুল আবার ভাবে, মেয়েগুলো না থাকলে এই যত্ন কে করত!

বাড়িটা শূন্য হয়ে গেলে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বকুল ভাবে, এই বাড়িটি আজ ওর আর সোহেলের। কি মজা। কি মজা। প্রেম ছাড়া মানুষ বাঁচবে কেন? মানুষের বাঁচার জন্য যা দরকার তার সব আমার চাই– বকুল দু'হাত উপরে তুলে ঘুরপাক খায়। আমার বাজান আমার জন্য বড় শিক্ষা। কত মনে করে মাকে– আহা বাজান আমার। শুধু একটা ভুল করে এখন কেঁদেকেটে, স্বপ্ন দেখে হয়রান হয়ে যাচ্ছে। ধানকাটা বন্ধ করে মায়ের বাড়ির কাছে বাতাস টানতে গেছে। সেই বাতাস টেনে বুকের ভেতরের পোড়া মরিচের গন্ধ বের করে দেবে। বাজান আপনেরে একশো বছর আয়ু দেক আল্লাহ। আপনার মেয়েরা আপনার চারপাশে থাকবে। কেউ আপনাকে ছেড়ে যাবে না।

উঠোনে ঢোকার আগে পেছন ফিরে তাকাতেই দেখতে পায় সোহেল আসছে। বেশ দূর থেকে দেখা যাচ্ছে। বকুল কিছুক্ষণ দাঁড়ায়। সোহেল হলে ওকে ডাকতে হবে। এই বাড়িতে ও এসেছে। কিন্তু খালি বাড়িতে না। বেশিরভাগ সময় বাড়িতে সবাই থাকতে এসেছে। তখন তো ভালবাসার কথা হয়নি। সে সময় আর এ সময় এক নয়। ও বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। সোহেলকে জানাতে হবে যে বাড়িতে কেউ নেই। আনন্দে ওর শরীর হিম হয়ে যায়। ও বাঁশের বেড়ার গায়ে নিজেকে ছেড়ে দেয়।

সোহেল কাছে এসে বলে, তোমাকে আমি দূর থেকে দেখেছি বকুল ফুল।

আমিও তোমাকে দেখেছি। চল ভেতরে যাই।

ভেতরে? বাড়িতে কেউ নাই?

উঁহু। বকুলের ঠোঁটে রহস্যের হাসি।

সোহেল একরকম চোঁচিয়ে বলে, নেই?

বকুল প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সোহেলের হাত ধরে টেনে উঠোনে এসে দাঁড়ায়।

আজ অনেক গল্প হবে?

সোহেল চোখ বুজে বলে, হবে।

হবে বলতে চোখ বুজলে কেন?

দেখতে চাই।

কি দেখতে চাও? অবাক করলে।

দেখতে চাই সাগরের তল।

সাগর? এই গ্রামে সাগর কোথায়?

আছে। দেখা যায় না।

ও, তাই। সাগরের নাম কি?

ভালবাসা। প্রেম।

ভালবাসা? প্রেম?

হ্যাঁ, তাইতো। বুঝতে পারছ না?

পারছি। ভালবাসার সাগর।

সোহেল ওর দু'হাত জড়িয়ে ধরে বলে, এখন আমরা কি করব?

গল্প।

শুধু গল্প?

তো আবার কি।

তাইতো, তো আবার কি।

উঠোনের জামগাছের নিচে বসে অজস্র স্বপ্নের কথা বলে যায় দু'জনে। দু'জনেই ভাবে, ভালবাসার প্রথম দিকের দিনগুলো এমনই হওয়া উচিত। কলকলিয়ে কথা বলে, হেসে, শুধু হাতে হাত লাগানো স্পর্শের সাগর বানিয়ে, দিনের গড়িয়ে যাওয়া দেখতে দেখতে, পার করে দেওয়া অজস্র বেলার পাড়ি পূর্ব থেকে পশ্চিমে আবার সূর্যওঠা – আবার দিনের শুরু।

বকুল প্রশ্ন করে, আমাদের সুখের দিনগুলো কি এমন থাকবে?

দাঁত কিড়মিড় করে সোহেল। খুব নিঃশব্দে, যেন বকুল কিছু বুঝতে না পারে। নিজে নিজে বলে, সুখের দিন না ছাতু, শুধু এভাবে বসে থাকলেই কি মন ভালবাসায় ভরে যায়? হাত ধরে ঘরে নিয়ে গেলেইতো বোঝা যেত ভালবাসা কত সুখের! এমন সুযোগ পাওয়া কি বারবার ঘটবে? জয়নুল মিয়া কতবার শরীর থেকে পোড়া মরিচের গন্ধ তাড়াতে বটগাছের নিচে বসে ধ্যান করবে? ওর রাগ হয়।

বকুল আবার বলে, কিছু বললে না যে?

আমি তোমার মত এত বোকা না?

বোকা? তুমি কোথায় আমার বোকামি দেখলে?

সুখের দিনটিন এসব নিয়ে আমার ভাবনা নাই। যত্তসব পেঁয়াজী ভাবনা।

তুমি এমন করে বললে?

তোমার বাবাকে দেখে বোঝ না যে সুখের দিন কেমন করে শেষ হয়।

বকুল দু'হাতে চোখ মোছে। সোহেলের হাত ছেড়ে দেয়। ধম করে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, প্রেম হতে না হতেই শরীর খোঁজ, এ তোমার কেমন ভালবাসা? দরকার নেই ভালবাসার।

রাগ কোরো না বকুল ফুল। আমি তো তেমন কিছু বলিনি। বোঝাতে চেয়েছি যে প্রেমের পথে কাঁটা আছে।

থাকুক কাঁটা, থাকুক। আজ তুমি যাও। শিউলি বুবুর আসার সময় হয়েছে। পদ্মও আসবে।

তুমি কি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ?

জানি না। এখন যাও। মনে রেখ সময় বুঝে সবকিছু চাইতে হয়। নইলে গোবরের ঘুঁটেও মেলে না।

যাই। আবার আসব।

বকুল কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। উঠোনজুড়ে ঘূর্ণি। এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে ভাললাগার সবটুকু। শুরুই যদি এমন হয়, তাহলে বাকি থাকবে কি! সুখের কোন স্থায়ী সময় নেই নাকি! প্রবল ভাবনায় বকুলের চারদিকে তোলপাড় করে? তাহলে মনে করতে হবে বাজান যে বটগাছ তলায় বসে আছে এটাও সুখের একটা দিক। ও বিমূঢ় হয়ে থাকে। ভাবনা নিয়ে বেশিদূর এগোতে পারে না। ও ভেবেছিল একরকম, হয়েছে আর একরকম। ও বুঝতে পারছে ওর মধ্যে দুঃখের চেয়ে রাগ বেশি। ক্রোধে ওর চারপাশে আবার ঘূর্ণি ওঠে। ও বসে থাকতে পারে না। উঠে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে থাকতে না পারলে পায়চারি করে। উঠোনে কয়েকবার ঘুরে রান্নাঘরের দরজায় বসে। বসে থাকাও হয় না। গেটের বাইরে এসে দাঁড়ালে দেখতে পায় বেশ খানিকটা দূরে রাস্তার ধারে বসে আছে সোহেল। ওকে গেটের সামনে দেখে একছুটে বকুলের কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলে, আমাকে মাফ করে দাও বকুল ফুল। আর এভাবে কথা বলব না। আমি ভুল করেছি।

বকুলের ভেতরে আবার তোলপাড় ওঠে। ও সোহেলের মুখের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে বাড়িতে ঢোকে। সোহেল পিছে পিছে এসে বলে, তুমি মাফ না করলে আমি উঠোনে বসে থাকব। যাব না। সবাই এসে দেখুক যে আমি বকুলকে ভালবেসে এখানে বসে আছি।

না, বসবে না। তুমি যাও।

তাহলে বল, মাফ করেছ?

ঠিক আছে, মাফ করলাম।

হুহা ক রে হেসে সোহেল বলে, তোমার আঙুল দাও আমাকে। আমি ধরে বলি, ভাব।

বকুলের তর্জনি ছুঁয়ে ও বেরিয়ে যায়। বকুল আবার স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ভাবে, ছেলেটি বোধহয় খানিকটুকু পাগল! পাগলের সঙ্গে কি ঘর হয়? নসীব! বকুল কপাল চাপড়ায়। আবারও প্রবলভাবে ওর চারদিকে তোলপাড় ওঠে। ও এক ঘোরের মধ্যে প্রবেশ করলে দেখতে পায় শিউলি বাড়ি ফিরেছে।

শিউলি ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকিয়ে বলে, তোর কি হয়েছে বকুল?

• পরবর্তী সংখ্যায়

সেলিনা হোসেন কথাসাহিত্যিক

জীবাণু থেকে সুরক্ষায়
ডেটল গোসল প্রতিদিন!

Dettol

BE 100% SURE

বেছে নিন আপনার পছন্দের ডেটল সাবান

PRIVATE MEDICAL PRACTITIONERS ASSOCIATION BANGLADESH ESTD 1977
*BPMPA

ডাক্তারদের দ্বারা স্বীকৃত
বাংলাদেশের একমাত্র সাবান

www.dettol.com.bd
facebook.com/dettolbd

ছোটগল্প

শূন্যতার করতালি

রফিকুর রশীদ

পরকীয়া শব্দের ব্যুৎপত্তি মনে পড়ে স্যার?

প্রশ্ন শুনে আমার পিলে চমকে ওঠার দশা। সোজাসুজি তাকাতেও পারি না, ম্রিয়মান হয়ে পড়ি সংকোচে। টিচার্স কমনরুমে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে বেশ ক'জন সহকর্মী। সন্দেহবাতিকগ্রস্ত মোজাম্মেল সাহেবও আছেন উত্তর কোণায়, ভাঁজভাঙা খবরের কাগজের আড়ালে কোন্‌দিকে তার কুতকুতে দৃষ্টি ফেলে রেখেছেন ঠিক আছে! মুখ খুললেই নর্দমার কাদাপাঁকের মত দুর্গন্ধ বেরোয়, কথা বলতে শুরু করলে তার মুখে বাধে না কিছুই। এই পরিবেশে মারিয়ার এটা কী ধরনের প্রশ্ন হল! পরকীয়া শব্দের ব্যুৎপত্তি জানা কি এতই জরুরি! মারিয়া সুলতানার এই এক দোষ– কারো কানকথা কিংবা বৈরী পরিবেশকে সে মোটেই পাত্তা দিতে চায় না। এটা তার গুণও বটে, চরিত্রের দৃঢ়তা। কত না স্পষ্টভাবে সে বলতেপারে– 'ও সব পাত্তা দিতে নেই স্যার। পাত্তা দিয়েছেন কি ভূতের মত লাফিয়ে উঠবে ঘাড়ে, ঠ্যাং দোলাবে ধেই ধেই। হুঁ।' কথা শুনে মনে হয় জীবনের অভিজ্ঞতা বুঝি ওর বয়সকেও অতিক্রম করেছে অনেক আগেই। হাতের চক্কডা স্টার, অ্যাটেন্ডেন্স খাতা নির্দিষ্ট ড্রয়ারে রেখে এসে মারিয়া আমার পাশের চেয়ারটিতে ধপাস করে বসে পড়ে। চশমাটা নামিয়ে রাখে টেবিলে। সোনালি ফ্রেমের রিমলেস গ্লাস। নাকের ডগায় এই চশমা চড়ানো তার বেশিদিনের নয়। মারিয়ার চশমাবিহীন নিরাভরণ মুখটুকুই আমার বেশি ভাল লাগে, মনে হয় কেমন যেন চড়ুই চড়ুই স্বভাব; কিন্তু ওই চশমা তার চেহারায় এনে দিয়েছে ভারিক্কি ছাপ।

আমি মুগ্ধ হয়ে শুনি মারিয়ার কথা। কী সুন্দর গুছিয়ে কথা বলে। আমাদের কলেজে সে ইতিহাস পড়ায়। কিন্তু তার অধিক আগ্রহ সাহিত্যে। নিজস্ব পড়াশোনার প্রাঙ্গণ ইতিহাস অপেক্ষা সাহিত্যের সীমানায় অধিক বিস্মৃত। সেই সুবাদেই আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। পাঠরুচি কিংবা কথা বলার ভঙ্গি নিয়ে প্রশংসা করলে গালে টোল ফেলে হাসিতে গড়িয়ে পড়ে। অবলীলায় বলে, এ সব তো আপনার কাছ থেকেই পাওয়া। আমি অভিভূত হই, খানিক বিব্রতও।

মারিয়ার নাকি মুখোশ পরার মত অনুভূতি হয়। আমি মনে করিয়ে দিই– শিক্ষকতার মুখোশ তো পরেই আছ সারাক্ষণ! 'শিক্ষকতার মুখোশ' শব্দযুগলের ব্যাপারে তার প্রবল আপত্তি। প্রতিবাদ জানায় তীব্রভাবে। মারিয়া এই রকমই। আজ তার মাথায় ঢুকেছে পরকীয়া। টেবিলের সঙ্গে বুক লাগিয়ে আমার দিকে ঝুঁকে সে বলে,

শব্দ তো শব্দই। ফুলের মত। থোকা থোকা, আবার একা একাও। গেঁথে দিলেই হয় কথার মালা।

আমি মুগ্ধ হয়ে শুনি মারিয়ার কথা। কী সুন্দর গুছিয়ে কথা বলে। আমাদের কলেজে সে ইতিহাস পড়ায়। কিন্তু তার অধিক আগ্রহ সাহিত্যে। নিজস্ব পড়াশোনার প্রাঙ্গণ ইতিহাস অপেক্ষা সাহিত্যের সীমানায় অধিক বিস্মৃত। সেই সুবাদেই আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। পাঠরুচি কিংবা কথা বলার ভঙ্গি নিয়ে প্রশংসা করলে গালে টোল ফেলে হাসিতে গড়িয়ে পড়ে। অবলীলায় বলে, এ সব তো আপনার কাছ থেকেই পাওয়া। আমি অভিভূত হই, খানিক বিব্রতও। আমি কিছুতেই মনে করতে পারি না, অথচ মারিয়ার জোর দাবি– সে আমার ছাত্রী ছিল। শিক্ষকতাজীবনের শুরুতে আমি যে কলেজের শিক্ষক ছিলাম, সেখান থেকেই নাকি তার ইন্টারমিডিয়েট। সেই ব্যাচের দু'চারজন ছাত্রছা ত্রীর চেহারা এখনো ভাসাভাসা মনে আছে। বিশেষ করে শান্তা নামে সায়েন্সের একটি মেয়ের মুখ আজো বেশ উজ্জ্বল হয়ে আছে। 'দুঃসময়' আবৃত্তি করে পুরস্কার পেয়েছিল। তার কণ্ঠের 'এখনই অন্ধ বন্ধ করো না পাখা'– আমি যেন এখনো দিব্যি শুনতে পাই। মারিয়ার দাবি শান্তা তারই সহপাঠী বান্ধবী, স্বামীর সঙ্গে কানাডায় থাকে; আজো তার সঙ্গে যোগাযোগ আছে। নাহ, আমি কিছুতেই শান্তার পাশে মারিয়ার মুখ মনে করতে পারি না। কৌতূহলে শুধাই,

তুমিও কি সায়েন্স পড়তে?

খিলখিল করে হেসে জবাব দেয়,

জ্বি স্যার। রোল নম্বর আনলাকি থার্টিন।

রোল নম্বর বলে আবারও হাসতে থাকে। আমি জিজ্ঞেস করি,

এত হাসির কী হল?

হাসতে হাসতেই সে ব্যাখ্যা দেয়,

তের দু'গুণে ছাব্বিশ। মানে ডাবল আনলাকি। অথচ আপনি সেই টুয়েন্টি সিক্সকে ঠিকই মনে রেখেছেন। এতদিনে বুঝলাম– নাম্বার থার্টিন যথার্থই আনলাকি।

আমি সবিস্ময়ে মারিয়ার দিকে তাকাই,

তার মানে তুমি বলছ– শান্তার রোল ছিল টুয়েন্টি সিক্স?

জ্বি। এতক্ষণে মনে পড়ছে সব!

হঠাৎ দেখি মারিয়ার চোখ ছলছল করছে। কিন্তু কেন, সেটাই আমি বুঝতে পারি না। ভয়ানক বিব্রত বোধ করি। দশ বছর পূর্বে আমার ছাত্রী থাকলেও তো বর্তমানে সে আমার সহকর্মী। কী কথায় কোন কথা উঠে এল যে তাকে এভাবে চোখের জল ফেলতে হচ্ছে! আঁচলে চোখ মুছতে হচ্ছে! আমি নিরুপায় হয়ে বলে উঠি–

এ সব কী হচ্ছে মারিয়া? তোমার কেন মন খারাপ?

না, মারিয়া সেদিন আর কোন কথাই বলে না। মারিয়া সুলতানার প্রকৃতিটাই ওই রকম। মনের আকাশে মেঘ জমলে ঘন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হয়ে জমাট বাঁধবে, তারপর কখনো এক পশলা বৃষ্টি ঝরিয়ে তবেই রক্ষা। মুড অফ হলে সেদিন কে আর কথা বলায় তাকে! এমনিতে সারাদিন সারাবেলা কথার খই ফোটে তার মুখে। মনটা তখন শরত আকাশ, মুঠো মুঠো রোদ্দুরছড়া নো কিংবা নির্মেঘ চাদরে জোছন্নাঝরা নো অমলধবল। তখন পেয়ে বসে কথার কাকলিতে। শব্দ নিয়েই কত রকম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তার। কী চমৎকার করে বলে সে,

শব্দের গায়ে রঙ চড়িয়েছে কে বলুন তো! শব্দের গায়ে গন্ধ মাখিয়েছে কে?

প্রশ্ন করার পর এক চিলতে হাসি ছড়িয়ে দেয় কাশফুলের মত। আমি তখন ওই হাসির গায়েও বর্ণগন্ধ খুঁজে পাই। অভিভূত হয়ে কান খাড়া করে থাকি। মারিয়া নিজে থেকেই জবাব দেয়– এ সব হচ্ছে কবিদের কাজ। শব্দকে পবিত্র করা, কলুষিত করা, এ সবের মানে হয়? একটুখানি থামে। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে চকিতে কী যেন জরিপ করে নেয়। তারপর সহসা সে ফিরে যায় পুরনো প্রসঙ্গে।

এই ধরুন, পরকীয়া শব্দটির কথা। কী দোষ এ শব্দের? কেউ কেউ এই শব্দের গায়ে মিঠেকড়া গন্ধ খুঁজে পায়, মিঠে আবার কড়া, তবে কি কাঠমল্লিকার মত? না, তার চেয়েও তীব্র, তবে কটু। চেতনা নাশ করে দেয়।

কোনমতে আমি উচ্চারণ করি,

কী সর্বনাশ!

মারিয়া চমকে ওঠে,

আপনিও তাই বলেন? টানা এক দীর্ঘশ্বাস পড়ে তার কণ্ঠে, হঠাৎ সে উচ্চারণ করে– হায় জীবনানন্দ!

আমি বলি, এর মধ্যে জীবনানন্দকে টানা কেন? না ভাবছি, কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালবাসে!

তোমার কথার জাদুকরী প্যাঁচ আমি বুঝি না মারিয়া। ছিলে বেশ পরকীয়ায়, হুট করে চলে এলে বেদনায়, মানে হয়?
হয় হয়। শব্দদু'টিতে কেমন গলায় গলায় ভাব, দেখতে পান না স্যার?
নাহ! আমার চোখে তো পড়ে না।
চোখে পড়ে ঠিকই, মুখে বলেন না।
এ তুমি কী বলছ!
ঠিকই বলছি। আপনার কাছেই তো প্রথম জেনেছি বেদনার রঙ নীল।
আমার কাছে জেনেছ! কবে?
সেই কবে। আমার আজো মনে আছে– 'কত দশা বিরহিণীর– এক দুই তিন দশটি'।
হ্যাঁ হ্যাঁ, 'আমার পূর্ববাংলা' কবিতার চরণ 'এখানে ত্রস্ত আকুলতায় চিরকাল অভিসার...।' সেই প্রথম বিরহিণী রাধার সঙ্গে পরিচয়, বেদনার নীলরঙ চিনতে শেখা।
কী আশ্চর্য। তুমি বাংলায় অনার্স পড়নি কেন বল তো!
শুনলে হাসবেন– সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়েও ইতিহাসে চান্স পেলাম, অথচ বাংলা বিভাগের দরজাই খুলতে পারিনি।
তাই নাকি! সে কারণেই বুঝি সাহিত্যের প্রতি তোমার এত টান!
মানুষ যা চেয়েও পায় না, তার প্রতি আকর্ষণ তো থাকবেই চিরকাল।
এতক্ষণে এসে আমি মর্মরিত হাহাকার শুনতে পাই, কাছেই কোথাও যেন বা বেজে ওঠে শূন্যতার করতালি। আজ বলে শুধু নয়, এর আগেও অনেকদিন আমাদের আলাপচারিতা ঘন হয়ে জমে ওঠার মুহূর্তে এসে মারিয়া এরকমই দীর্ঘশ্বাসের উত্তাপ ছড়িয়ে দেয়। তখন সব কিছু নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে, বর্ণহীন হয়ে পড়ে। আজ আমি ইচ্ছে করেই একটু আঘাত দিতে চাই, সোজাসুজি জানতে চাই,
তুমি কী পাওনি বল তো শুনি, কী নেই তোমার?
সে হিসেব তো মেলাইনি আজো!
এ তোমার বেদন্মবিলাসিতা মারিয়া।
তা বলতে পারেন। তবে রবীন্দ্রনাথের গানের বাণী আমাকে ভীষণ নিঃসঙ্গ করে দেয়, প্রবলভাবে দগ্ধায়। তখন নিজেই বুঝি না– 'কী জানি পরান কী যে চায়...।'
কিন্তু তোমার এই হাহাকার, এই না পাবার আর্তি যে অন্যকেও সংক্রমিত করতে পারে, এটা কখনো ভেবেছ?
না তো! এই অনুভূতি কি আদৌ সংক্রমণযোগ্য?
এইখানে এসে আমি ব্রেক কষি, সোজাসুজি জবাব না দিয়ে বলি,
থাক এ সব কথা। বেদনার রঙ নিয়ে কথা বলছিলে, সেই বরং ভাল। বল শুনি।
এক চিলতে বিষণ্ন হাসি ছড়িয়ে মারিয়া বলে,
নীলরঙ গাঢ় থেকে আরও আরও প্রগাঢ় হলে তখন কালো হয়ে যায় জানেন তো? আর কালো রূপ রঙ নিয়ে বাংলা ভাষায় কত কিছু যে সৃষ্টি হয়েছে তার তো ইয়ত্তাই নেই।
তা ঠিক। এক শ্রীকৃষ্ণের কারণেই কত যে পদ লেখা হয়েছে, গাওয়া হয়েছে।
মারিয়া সহসা বেশ উষ্ণ হয়ে ওঠে, দুম করে প্রশ্ন করে বসে,
তবে কি এই জন্যে পরকীয়ার রঙ হয়েছে কৃষ্ণকালো?
আমি চমকে উঠি, বলে কী মেয়েটা! পরকীয়ারও রঙ খুঁজে আবিষ্কার করেছে?
কে বলল তোমাকে– ওই রঙ কৃষ্ণকালো?
শুধু কি কৃষ্ণকালো? শুনেছি সে নাকি ভ্রমরকালো। রঙ নির্বাচনেও কেমন রোমান্টিকতা দেখেছেন!
কাক কালো কোকিল কালো, কিংবা মেঘ কালো আঁধার কালো এসব তাহলে তুচ্ছ?
ঠিক ধরেছেন। ভ্রমরকালো শব্দের ব্যঞ্জনাই আলাদা।
সহসা আমি হা হা করে হেসে উঠি উচ্চ স্বরে। ধীরে ধীরে কখন আমাদের টিচার্স কমন রুম ফাঁকা হয়ে গেছে। বেলা গড়িয়ে পড়েছে অপরাহ্নের গায়ে। পড়ন্তবেলায় আমার হাসি খটখট করে বেজে ওঠে কর্কশ শব্দে। কী আশ্চর্য, সেটা মারিয়ার কানেও ধরা পড়ে যায়! সে আমার হাতের উপরে আলতো ভাবে তার হাত ছুঁয়ে জিগ্যেস করে,
স্যার, আপনি কি কাঁদছেন?
আমার অন্তর্বোবাই রে হঠাৎ বিদ্যুৎ খেলে যায়। নিজেকেই প্রশ্ন করি– কেন, আমি এভাবে কাঁদব কেন? আমার অন্তরে কেন গুমরে উঠবে হাহাকার? কী নেই আমার ? স্ত্রীপু ত্র, ঘর্ন্ন সংসার– সব মিলিয়ে আমি এক মধ্যবয়সী গৃহী মানুষ। হ্যাঁ, আমার কন্যাতৃষ্ণা অনিবারিতই রয়ে গেছে বটে, তাই বলে কি আমি এই মারিয়ার মধ্যে কখনো সেই কন্যার ছবি খুঁজেছি, বুকের ভেতরে কে এক সন্ন্যাসী মাথা ঝাঁকিয়ে না না করে ওঠে। তাহলে মারিয়া আমার কে– প্রাক্তন ছাত্রী? সহকর্মী? কত সহজেই সে বলতে পারে, শুকনো হাসি দিয়ে আপনি ভেতরের অশ্রুপাত কেন ঢাকতে চাইছেন?
আমার মগজের কোষে চিনচিন করে রাগ চড়ে যায়, চাঁদি দপদপ করে– আমার ভেতরে য়াই ঘটুক, কেন আমি তার কৈফিয়ৎ দিতে যাব? কার কাছে জবাবদিহির দায় আমার? বহু কষ্টে নিজেকে সংযত করে আমি প্রস্তাব রাখি,
চল উঠি মারিয়া, বেলা অনেক গড়িয়েছে।
মারিয়া তখন শব্দশ ব্দ খেলার মধ্যে নিজেকে আড়াল করে। সে বলে– মানুষ কতভাবে যে শব্দের উপরে নির্যাতন করে স্যার! কী এমন বেলা গড়িয়েছে আপনার!
মারিয়ার এ প্রশ্নে আমি ম্রিয়মান হই, জবাব দিতে পারি না কিছুই।

রফিকুর রশীদ শিক্ষাবিদ, কথাকার

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

ভারতে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রাক্তন ছাত্রদের প্রতি আবেদন

ভারত বিচিত্রার পক্ষ থেকে ভারতে শিক্ষাপ্রাপ্ত বাংলাদেশ ছাত্র সমিতি (Association of Bangladesh Students Studied in India-ABSSI)র সদস্যসহ ভারতের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাপ্রাপ্ত বাংলাদেশী প্রাক্তন ছাত্রদের নিয়মিত স্বল্পদৈর্ঘ্য রচনা ও মতামত পাঠানোর আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। এখন থেকে *ভারত বিচিত্রার* এক পৃষ্ঠায় এইসব লেখা নিয়মিতভাবে ছাপা হবে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে *ভারত বিচিত্রা* আইসিসিআরবৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রসহ ভারতের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে একটি সেতুবন্ধ রচনা করতে আগ্রহী যাতে এবিএসএসআইএর কর্মকাণ্ড এবং ভারতে তাঁদের অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণ জনসমক্ষে প্রচারিত হয়। এভাবে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের বিদ্যমান উষ্ণ সম্পর্কে তাঁরা আরো গতিবেগ সঞ্চার করতে পারবেন বলে আমাদের ধারণা।

মাসের প্রথম সপ্তাহে *ভারত বিচিত্রার* ঠিকানায় প্রাপ্ত লেখা পরবর্তী মাসে ছাপার জন্য বিবেচিত হবে।

নিবন্ধ

বাংলা ভাষার বিকাশ ও বিশ্বায়ন

দীপিকা ঘোষ

বাঙালি জাতির উৎপত্তির মত তার ভাষার বিকাশলাভও জটিল আর মিশ্রিত। এই দুইয়ের আদিম পরিচয় সনাক্ত করতে তাই নৃতত্ত্ববিদ ও ভাষা সুপণ্ডিতরা বিচার বিশ্লেষণের জন্য পেছনে ফিরে গিয়েছেন খ্রিষ্টপূর্ব চার হাজার বছর অবধি। তখন ভারতবর্ষে বৈদিক আর্যদের আগমন এবং সাংস্কৃতিক প্রভাব সম্পূর্ণ হয়ে ওঠেনি। তার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বসবাস রয়েছে দ্রাবিড়, তিব্বতীয়বার্মন এবং অস্ট্রোএশিয়াটিক জনগোষ্ঠীর। যাই হোক, বাংলা বা বেঙ্গল শব্দের অরিজিন সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া না গেলেও পণ্ডিতদের অভিমত– ১০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ভারতের পূর্বাঞ্চল জুড়ে 'বঙ্' নামের যে দ্রাবিড় ভাষাভাষী ট্রাইবদের বসবাস ছিল 'বাংলা' শব্দের উৎপত্তি তার থেকেই হয়েছে। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাংলা ভাষার আদিমতম নিদর্শন হিসেবে সহজিয়া বৌদ্ধ সাধকদের যোগসাধনার গুহ্য বিষয় নিয়ে রচিত চর্যাগীতিকাগুলিকে চিহ্নিত করেছেন। সুরসহযোগে এই গীতিকাগুলি গীত হত সাধকদের সাধন্নভজ নের জন্য। এদের বয়স আনুমানিক ১০০০ থেকে ১২০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে। তবে সাহিত্যমূল্য সমন্বিত চর্যাগীতির এই অসাধারণ রচনাগুলি বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শনমাত্র। যখন সবেমাত্র অন্যান্য ভাষা থেকে এক স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে সে জন্মলাভ করতে শুরু করেছে। পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরে আধুনিক বাংলা ভাষা ধীরে ধীরে বহু ভাষার দ্বারস্থ হতে হতেই সম্পূর্ণতা পেয়েছে এবং তার পরিপূর্ণ পরিশীলিত রূপায়ণ ঘটেছে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে বেঙ্গল রেনেসাঁর মধ্য দিয়ে।

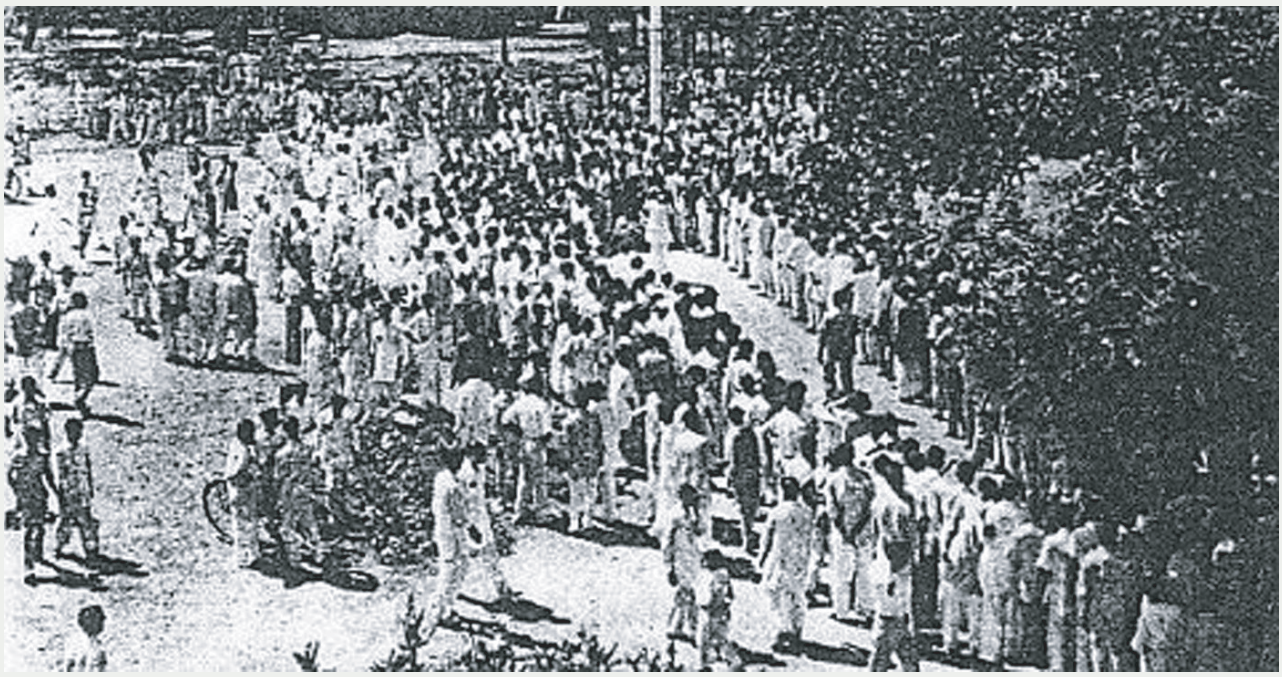

ভাষা আন্দোলনে প্রতিবাদী ছাত্রজনতা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং সবশেষে কবি রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলামের হাত ধরে।

বাংলা শব্দ বিশ্লেষণ করে ভাষাবিদরা প্রমাণ করেছেন, ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলীয় আরও অনেক ভাষা– যেমন অসমীয়া, ওড়িয়া, ভোজপুরি, মৈথিলি, মাঘী প্রভৃতি মাগধীপ্রাকৃতই বাংলা ভাষার জননী। মাগধী প্রাকৃতকে কেউ কেউ অর্ধমাগধী বলেও আখ্যায়িত করেছেন। প্রাচীন ভারতে এই ভাষার জন্মলাভ সংস্কৃত এবং পালির ব্যবহার ক্ষয়িষ্ণু হওয়ার মূহূর্ত থেকে। মাগধীপ্রাকৃত সংস্কৃত এবং পালি ভাষার অপভ্রংশ রূপের সংমিশ্রণে তৈরী। প্রচলিত বিশ্বাস, বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতমবুদ্ধ এই ভাষাতেই কথা বলতেন। বৌদ্ধসম্রাট মহামতি অশোক অর্ধমাগধীকে আনুষ্ঠানিক রাজভাষার মর্যাদা দান করায় এর প্রসার ক্রমে গোটা পূর্বাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। প্রাচীন বাংলার আমজনতা অবশ্য সেকালে মাগধীপ্রাকৃতের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। তাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারের জন্য নিজস্বতম ভাষা ছিল, যার ওপর প্রভাব ফেলেছিল অনার্য দ্রাবিড় ভাষাভাষী গোষ্ঠীসহ আদি অস্ট্রোএশিয়াটিক জনগোষ্ঠীর ভাষাসমূহ। বাংলা ভাষার জননী তাই অর্ধমাগধী হলেও বাঙালির মাতৃভাষা মিশ্রিত ভাষা হবার কারণে অন্যান্য অনেক ভাষার কাছেই ঐতিহাসিকভাবে ঋণী। মধ্যযুগের শাক্ত, বৈষ্ণব এবং রোমান্টিক সাহিত্যের বাংলা ভাষা সম্বন্ধেও একই কথা সত্য। তবে আধুনিক যুগে মানবতন্ত্রের জীবনমুখী সাহিত্য সৃষ্টির ভাষা হিসেবে বাঙালির মাতৃভাষার পর্যাপ্ত ঋণ ক্ল্যাসিক সংস্কৃত শব্দের কাছে। কারণ ঊনবিংশ শতকের বাংলার নবজাগরণের ফলে বিভিন্ন সুসাহিত্যিক ও চিন্তাবিদদের অবদানে বাংলা ভাষা যে রাজকীয় রূপ পরিগ্রহ করেছিল, তার প্রধান বাহন ছিল ক্ল্যাসিক সংস্কৃত শব্দ।

বাংলা লৈখিক ভাষায়, বিশেষত সমৃদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টির ভাষায় তৎসম এবং তদ্ভব শব্দের প্রাচুর্য রয়েছে সত্যি, তবে অন্যান্য বৈদেশিক ভাষার উপস্থিতিও অগ্রাহ্য করার মত নয়। এর কারণ ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে বাংলা মুলুকসহ ভারতবর্ষ বারবার শাসিত হয়েছে বিভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভাষী সুলতান সম্রাটদের দ্বারা। বাংলা শব্দে তাই আরবি, ফারসি, তুর্কি শব্দের যেমন অনুপ্রবেশ হয়েছে, তেমনি ষোড়শ শতক থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত পর্তুগিজ, ডাচ, ফরাসি, ইংরেজের রাজ্যপাট শেষ না হওয়া অবধি প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে অনেক পশ্চিমা শব্দাবলিও।

বাংলা ভাষার বিশ্বায়নের প্রশ্ন যদি তুলতে হয় তাহলে তার ক্রমবিকাশের ধারা বিশ্লেষণ করলে এমন কথা বলা যায়, বিভিন্ন ভাষার সংমিশ্রণে প্রাচীনকাল থেকেই সীমিত পরিসরে ঘটে গিয়েছে তার বিশ্বায়ন। বর্তমানেও তার বিকাশ এবং বিশ্বায়ন দুটোই ঘটে চলেছে দ্রুতগতিতে। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, একটি পরিপূর্ণ বিকশিত সমৃদ্ধিশালী ভাষার ক্ষেত্রে বিকাশ এবং বিশ্বায়নের সুযোগ থাকে কিনা? এর উত্তর– সভ্যতার ক্রমবিকাশ যেমন একটি চলমান প্রক্রিয়া তেমনি সভ্যতাসং স্কৃতির ধারক হিসেবে ভাষার ক্রমবিকাশেরও থেমে থাকার সুযোগ নেই। এখানে বিশ্বায়ন মানে বাঙালির নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক বিশ্বে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বজুড়ে বাংলা ভাষার চর্চা। অন্য ভাষাভাষীর ওপরে তার প্রভাব বিস্তার এবং একই সঙ্গে অন্য ভাষার শব্দপুঞ্জকেও ধীরে ধীরে নিজের মৌখিক কিংবা লিখিত মাতৃভাষায় আত্মস্থ করে নেওয়া।

ভাষার বিশ্বায়ন, ভাষার সংমিশ্রণ প্রাচীনকালেও বহুবার হয়েছে অপ্রতিরোধ্যভাবে এবং এভাবেই পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছে নতুন নতুন উচ্চারণে, নতুন নতুন অপভ্রংশে নতুন নতুন মাতৃভাষা। প্রাচীনকালে ভাষা বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া চলেছে এক দেশের অন্য দেশকে বিজিত করার মাধ্যমে; ব্যবসাবাণি জ্যের মধ্য দিয়ে কিংবা ধর্ম প্রচারের প্রসারতায়। মধ্য যুগের শেষপাদে, আধুনিকযুগের আরম্ভে সেটা হয়েছিল উপনিবেশ তৈরির ভেতর দিয়ে। বর্তমানে আরও অনেক ভাষার মত বাংলা ভাষার সৃজনপ্রক্রিয়াও প্রবহমান রয়ে গেছে বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়া তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নে। আন্তর্জাতিক বিশ্বের লক্ষ লক্ষ বাঙালি এখন অন্তর্জালে প্রতিদিন পাঠ করছেন বাংলা ভাষায় সংবাদপত্র; টেলিভিশন চ্যানেলে দেখছেন মাতৃভাষায় বিভিন্ন অনুষ্ঠান; দেশের বাইরে নিজেরা বাংলা ভাষার চর্চা করছেন প্রতিনিয়ত। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সংযুক্ত করছেন তাদের শেকড়সং স্কৃতির সঙ্গে। প্রবাসজীবনের নানা উৎসবঅনু ষ্ঠানে বাঙালির ঐতিহ্য, বাঙালির সংস্কৃতি যেমন চর্চিত হচ্ছে, তেমনি তার প্রভাব সীমিত আকারে হলেও প্রতিফলিত হচ্ছে বিভিন্ন দেশের নেটিভ জনগণের জীবন্ন মননেও। বাংলা ভাষা বিশ্বে আজ একটি সুপরিচিত ভাষা। পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিশ্বের ৬ হাজার ৯শো ৯টি ভাষার মধ্যে তার অবস্থান

রমনায় ছাত্রদের মিছিল

পরবর্তীকালে এই আন্দোলনেরই বিয়োগান্তক প্রকাশ– ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সালাম, বরকত, জব্বারদের বুকের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়ে। পূর্ব বাংলার বাইরে মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠার জন্য কঠিন কঠোর সংগ্রাম করেছেন অসম প্রদেশের অগণিত বাঙালিও, যার বিয়োগান্তক পরিণতি দেখি ১৯৬১ সালের ১৯ মে শিলচর রেলওয়ে স্টেশনে পুলিশের গুলিতে ১১ বাঙালির আত্মাহুতির মধ্যে।

পঞ্চম স্থানে। কেন্নুনা সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী সারাবিশ্বে বাঙালি পপুলেশন এখন প্রায় সাতাশ কোটির কাছাকাছি। বাংলা বাংলাদেশের প্রধানতম ভাষা এবং বাংলা, এশিয়া মহাদেশের তৃতীয় বৃহত্তম দেশ ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর ভাষা। পশ্চিমবাংলা, অসম্মি ত্রিপুরা রাজ্যের একটি বড় অংশই বাঙালি। দক্ষিণ এশিয়ার এই দু'টি দেশের জাতীয় সঙ্গীত, ভারতের জাতীয় স্তোত্রও বাঙালি কবির বাংলাভাষায় রচিত– কোটি কোটি মানুষের কণ্ঠে আবেগে ভালবাসায় যা উচ্চারিত হয় প্রতিদিন।

বিশ্বায়নের কারণে অন্য সব সভ্যজাতির মাতৃভাষার মত বাঙালির মাতৃভাষাতেও বিভিন্ন ভাষার সংযোজন ঘটে চলেছে নিরন্তর। কারণ যে জাতি বহির্বিশ্বে যত বেশি কর্মতৎপর, যত বেশি অন্যান্য জাতির সঙ্গে তার সংযোগ সাধন ও ভাবের আদান প্রদান, তার মাতৃভাষার সঙ্গে, সংস্কৃতির সঙ্গে অন্যের ভাষার, অন্যের সংস্কৃতির মিশ্রণ তত বেশি স্বাভাবিক। কিন্তু নিজের মাতৃভাষার প্রতি ভালবাসার আবেগ তাতে কখনো ব্যাহত হয়নি বাঙালির। তার চেতনায় জননীর পরেই জন্মভূমি এবং মাতৃভাষার অবস্থান। কেন্নুনা, অবয়ব যেমন কোন বস্তু কিংবা ব্যক্তির সুনির্দিষ্ট অস্তিত্বকে প্রতীয়মান করে, তেমনি ভাষার মাধ্যমেই মানুষ নির্দিষ্ট জাতি আর তার সংস্কৃতির ধারক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। যতকাল একটি জাতির মাতৃভাষা অস্তিত্বমান থাকে, ততকাল বেঁচে থাকে তার নিজস্ব সংস্কৃতি এবং যতকাল সেই সংস্কতিকে জাতি ধারণ করে থাকে, মাতৃসমা মাতৃভূমির অস্তিত্বও মানুষ টিকিয়ে রাখে ততকাল। মাতৃভাষা তাই কেবল মনোভাব প্রকাশের মাধ্যম নয়। সভ্য পৃথিবীর বুকে জাতির অস্তিত্বমান থাকারও একটি প্রধানতম শর্ত তাই।

সে কারণে, ভারত বিভাজনের পরে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মুহম্মদ আলী জিন্নাহ এবং পরবর্তীকালে খাজা নাজিমউদ্দীন উর্দুকেই যখন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেন, প্রতিবাদ করেছিলেন বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী সচেতন সুধীসমাজ। এই প্রস্তাবের বিপক্ষে ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল গণসমাবেশ আর আন্দোলনের কঠোর কঠিন সূচনাপর্ব। অধ্যাপক নূরুল হক ভুঁইয়া, এসেম্বলি সদস্য শামসুল হকসহ আরও অনেকে সংখ্যাগুরু বাঙালির মাতৃভাষার বিরুদ্ধে এই অবিবেচক অবিচারকে মেনে নিতে পারেননি। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার বিপক্ষে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন এ্যাসেম্বলির সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্তও। পাকিস্কস্তান গণপরিষদে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব তুলেছিলেন তিনি। বলেছিলেন– মাতৃভাষায় কথা বলার, রাষ্ট্রীয়ভাবে ব্যবহার করার অধিকার বাঙালির জন্মগত। তাঁর প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়েছিলেন তৎকালীন পূর্ব বাংলার বিশিষ্ট আইনপ্রণেতা প্রেমহরি বর্মণ, ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত এবং শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পরবর্তীকালে এই আন্দোলনেরই বিয়োগান্তক প্রকাশ– ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সালাম, বরকত, জব্বারদের বুকের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়। পূর্ব বাংলার বাইরে মাতৃভাষা প্রতিষ্ঠার জন্য কঠিন কঠোর সংগ্রাম করেছেন অসম প্রদেশের অগণিত বাঙালিও, যার বিয়োগান্তক পরিণতি দেখি ১৯৬১ সালের ১৯ মে শিলচর রেলওয়ে স্টেশনে পুলিশের গুলিতে ১১ বাঙালির আত্মাহুতির মধ্যে। কিন্তু তাঁদের এই আত্মবলিদান বিফলে যায়নি। ভাষা শহীদদের আত্মত্যাগের মূল্যায়ন হয়েছে ভাষা শহীদ দিবসকে জাতিসংঘের 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতিদানের ভেতর দিয়ে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে মধ্যযুগের জীবনপদ্ধতি থেকে বেরিয়ে এসে বাঙালিজাতি জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে নতুন জীবনের উজ্জীবনে লালিত হয়েছিলেন বারংবার। আপন পরিচয়ের প্রতি, আপন শিল্প এবং সংস্কৃতি রক্ষার জন্য, মাতৃভাষার লালন এবং সমৃদ্ধিসাধনের স্বপ্নে এক অপ্রতিরোধ্য ভালোবাসার আকর্ষণ জন্মেছিল তার চেতনায়। একবিংশ শতকে দাঁড়িয়ে সেই স্বপ্নই পরিণতি পেল, সুললিত বাংলাভাষায় জাতিসংঘের জনসমুদ্রে দুই বাঙালি প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতাদানে। এঁদের একজন বাঙালির জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান। অপরজন তাঁরই সুযোগ্যা কন্যা শেখ হাসিনা। লিখিত কিংবা মৌখিক ভাষা যেহেতু মানবমনের বিচিত্র ভাব আদানপ্রদানের এবং অস্তিত্ব বিকাশের সুনির্দিষ্ট মাধ্যম, সভ্যজগতে তাই শ্রদ্ধাসহকারে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে মাতৃভাষা মূল্যায়নের সফলতর প্রচেষ্টা। শ্রদ্ধাবোধ এবং বিশ্বমানবের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা স্থাপনের দাবিতে ইউনাইটেড নেশনস হিউম্যান রাইটস কমিটির আইন অনুযায়ী যে ল্যাঙ্গুয়েজ পলিসি প্রচলিত রয়েছে, সেখানে মানুষের মাতৃভাষা ব্যবহারের অধিকার জন্মগত অধিকার হিসেবেই স্বীকৃতিলাভ করেছে তাই। বাংলাভাষা এই শত্নসহ স্র মাতৃভাষার সমারোহে বিশ্বের দরবারে আজ অলংকৃত করে রেখেছে একটি গৌরবময় আসন। বাঙালির বাংলা ভাষা বিকশিত হতে হতে, বিশ্বায়িত হতে হতে বাঙালির ভালোবাসায়, বাঙালির চৈতন্য জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে মহাসমারোহে। ছড়িয়ে পড়েছে গোটা জগতের কোণে কোণে, তার অস্তিত্ব বিকাশের মহানতম প্রতিভূ হয়ে।

দীপিকা ঘোষ
শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক

Standard Chartered

When businesses succeed, livelihoods flourish.

In 2009, we took the initiative to be first to align with the World Bank Group in boosting global trade flows. Since then, we have continued to be proactive in encouraging growth across our markets. As trade is the lifeblood of the local economy, our commitment does more than protect businesses. It stimulates the communities that depend on them.

Here for good

Discover more at
standardchartered.com/answers

উৎসব

গানের ভেলায় বেলা অবেলায়

মার্গ সঙ্গীত মহোৎসব বসেছিল ঢাকায় ২০১৩ শেষ ভাগে। এই উৎসব বাংলাদেশের গৌরব-মুকুটে নতুন পালক। ভারতের আইটিসি এসআর-এর সহায়তায় বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের দ্বিতীয় আয়োজন ছাপিয়ে গিয়েছিল প্রথমকে। দর্শকসারিতে নানা প্রজন্মের উপস্থিতিতে প্রতিসরিত হয়েছে সুরের জয়গাথা, রঙ আর ঔজ্জ্বল্য। বিশেষত, তারুণ্যের সঙ্গীতোচ্ছ্বাস এই আয়োজনের মহার্ঘ প্রাপ্তি। রাতের মৃদু শীত, জাগরণ, রাজনীতির অস্থির পরিস্থিতি আর ঝুঁকি সত্ত্বেও সঙ্গীতের প্রতি মানুষের নিখাদ অনুরাগ চিনিয়েছে নতুন এক বাংলাদেশকে কিংবা বলা যেতে পারে, এটাই প্রকৃত প্রতিচ্ছবি, যা ভুলতে বসেছিলাম আমরা। বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের বদান্যতায় আরও অন্তত এক দশক বাঙালি প্রতিবছর একই সময়ে সুরের ঝর্নাধারায় অবগাহনের সুযোগ পাবে। আইটিসি এসআর-এর সহায়তা আর পৃষ্ঠপোষকদের মহানুভবতাও সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ধন্যবাদার্হ। অধিকন্তু আয়োজক বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের শুদ্ধ সঙ্গীতের মাধ্যমে আনন্দবিধানের নিঃস্বার্থ উদ্যোগ, সহাস্যে, সানন্দে মহাযজ্ঞ আয়োজনের ক্লেশ সামলানোর ঐকান্তিকতা আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করে। বলা বাহুল্য নয়, আয়োজকদের কল্যাণে কিংবদন্তি শিল্পীদের কেবল সামনাসামনি শোনা নয়, দেখা নয়, তাদের সঙ্গে আলাপচারিতার সুযোগও মিলেছে। প্রথমেই আমরা মুখোমুখি হয়েছিলাম রুদ্রবীণার মহান সাধক ওস্তাদ বাহাউদ্দিন মহিউদ্দিন ডাগরের।

রুদ্রবীণার সাধক
ওস্তাদ বাহাউদ্দিন মহিউদ্দিন ডাগর

রুদ্রবীণায় বিশ পুরুষের বাহাদুরি। বলা হয় এটা শিবের প্রিয় বাদ্যযন্ত্র। অথচ পরম্পরায় এটি বাজিয়ে চলেছে উত্তর ভারতের স্বনামধন্য একটি মুসলিম পরিবার– ডাগর। এমনকি তাদের বাদনশৈলীও সেই পরিবারের নামানুসারে। ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর পারস্পরিক সম্প্রীতির ক্ষেত্রে এর চেয়ে উজ্জ্বল নজির আর কী হতে পারে! সেই ডাগর পরিবারের বিশতম প্রজন্ম ওস্তাদ বাহাউদ্দিন মহিউদ্দিন ডাগর। বিলুপ্তপ্রায় বাদ্যযন্ত্র রুদ্রবীণার আরাধ্য সুর অনুরণিত হয় তাঁর আঙুলস্পর্শে। যন্ত্রটিও তাঁরই মত পুরুষালি। তারের ঝঙ্কার আটকে রাখে শ্রোতাকে। এই শিল্প তিনি রপ্ত করেছেন বাবা ওস্তাদ জিয়াউদ্দিন বাহাউদ্দিন ডাগরের কাছ থেকে। মাত্র ১২ বছর বয়সে তাঁর তালিম নেওয়া শুরু। তবে তারও আগে, মাত্র সাত বছর বয়সে মা প্রমীলা দেবীর কাছে শিখেছেন সেতার।

নিজের বাদনরীতি সম্পর্কে বললেন, 'আমি বাজাই ডাগরবাণী ঢঙে। এই শৈলী আমাদের পারিবারিক পরম্পরা। রুদ্রবীণা বিলুপ্তপ্রায়– ১৯৯০ সালে বাবার মৃত্যুর পর ডাগর রুদ্রবীণা পরম্পরায় শূন্যতা আসে। চাচা জিয়া ফরিদউদ্দিন ডাগরও বাজাতেন। তাঁর কাছেও তালিম নিয়েছি। তবে মঞ্চে বাজানো শুরু করি বাবার মৃত্যুর পরই। তখন আমার বয়স বিশ বছর হবে'।

– সেই প্রথম দিন কিংবা আজও কোন কনসার্টে বাজাতে গিয়ে কি পরম্পরা, পারিবারিক ঐতিহ্য ধরে রাখার চাপ অনুভব করেন?

– 'আমি এটা চাপ না বলে দায়িত্ব বলি। এটা তো আছেই। তবে ডাগরবাণী আসলে সাধারণ গীতি অনুসরণ করে। এই রীতিতে অনেকেই বাজান।'

– রুদ্রবীণা ছাড়া শিখেছেন সেতার। আর কী বাদ্যযন্ত্র শিখেছেন আপনি?

– 'হ্যাঁ, বাবা আমাকে আরও শিখিয়েছেন সুরবাহার, সুরশৃঙ্গার আর সরোদ'।

- তবে বাবার বীণা কনসার্টে প্রথম বাজানোর অভিজ্ঞতা কেমন ছিল?

– 'বয়স তখন অত নয়। প্রথম মঞ্চে। ইমোশন তো ছিলই। আর ছিল রেসপনসি-বিলিটি। মনে হয়েছিল পরিবারের লিগাসি এখন আমাকেই কাঁধে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। বীণা হাতে নিয়ে আমি অবশ্য নস্টালজিক হয়েছি। বাবার স্মৃতি আমাকে বিভোর করেছে। ওই বীণা আমি মাঝে মাঝেই বাজাই। তবে এবার ঢাকায় যেটা নিয়ে এসেছি, সেটা একেবারেই নতুন। প্রথম কোন কনসার্টে বাজানো হল'।

– শুনেছি, আপনিও একটা বীণা তৈরি করেছেন– যেখানে রয়েছে আপনার নিজস্বতা।

– 'আমি আসলে সরস্বতী-বীণা আর রুদ্রবীণার মেলবন্ধন ঘটিয়েছি। এই বীণা কর্ণাটকি আর

উত্তরাঞ্চলীয়– উভয় স্টাইলেই বাজানো যাবে। আমি এটার নাম দিয়েছি রাজবীণা। মাঝে মাঝে বাজাই'।

– অত্যন্ত সম্মানজনক সংগীত-নাটক একাডেমি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন সম্প্রতি। পেয়েছেন আরও অসংখ্য সম্মাননা। স্বীকৃতিকে আপনি কিভাবে দেখেন?

– 'প্রতিটিই প্রাণিত করে। তবে আমার বাবার একটা কথা এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায়। বাবা বলতেন, এটা অনেকটা গলায় ঘণ্টা বাঁধা গরুর মত। চললেই বাজবে। আর সেই আওয়াজ মনে করিয়ে দেবে, সচেতন করবে আপনার দায়িত্ব সম্পর্কে'।

– আপনার অজস্র শিক্ষার্থী। দেশে-বিদেশে। আপনি অনেক আধুনিক মানুষ। সমসময়ের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলেন। ইন্টারনেটে বিদেশিদের শিক্ষাও দেন।

– 'এটা আসলে সময়ের দাবি। ওদের পক্ষে ভারতে এসে সব সময় শেখা সম্ভব নয় বলেই এটা করি। আবার আমি গুরুকূল প্রথাতেই বিশ্বাস করি। কারণ, আমি বিশ্বাস করি, রুদ্রবীণা চর্চার গভীরতা অর্জন করতে হয় হৃদয়ের অতল থেকে, আর নিরন্তর সাধনায় আত্মস্থ করতে হয় এর সুরের অন্তর্বাণী। তবে আমি আশাবাদী নতুনদের বিষয়ে। আমি নিশ্চিত, রুদ্রবীণার বিলুপ্তপ্রায় ঐতিহ্য আবার ফিরে আসবে'।

– শেষ তো করতেই হয়। এই উৎসব সম্পর্কে আপনার ভাবনা কী?

– 'আমার দৃষ্টিতে এটা অত্যন্ত বড় একটা উদ্যোগ। পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া এ ধরনের শিল্পচর্চার উন্মেষ ঘটে না। উপমহাদেশের সঙ্গীতচর্চায় উৎসব বিশেষ মাত্রা যোগ করবে। বেঙ্গল ফাউন্ডেশনকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাতেই হয়। এই ফেস্টিভ্যালে তো বটেই, বাংলাদেশে এবারই প্রথম আসা। বাদনানন্দের পাশাপাশি এত মহারথী শিল্পীর গান শোনা, বাজনা উপভোগ করা, নাচ দেখা এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা।

ঋণ স্বীকার **টিম ক্যানভাস**

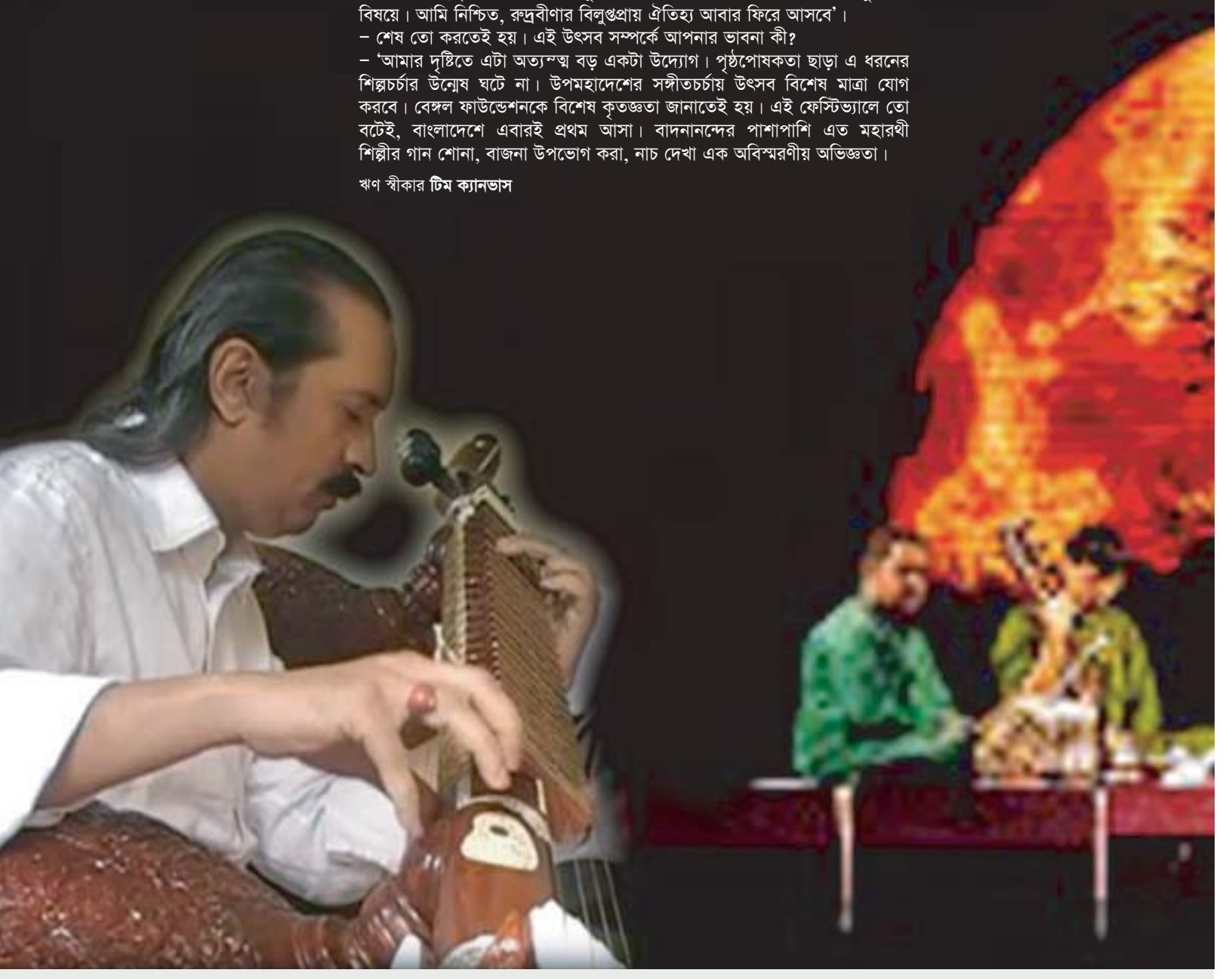

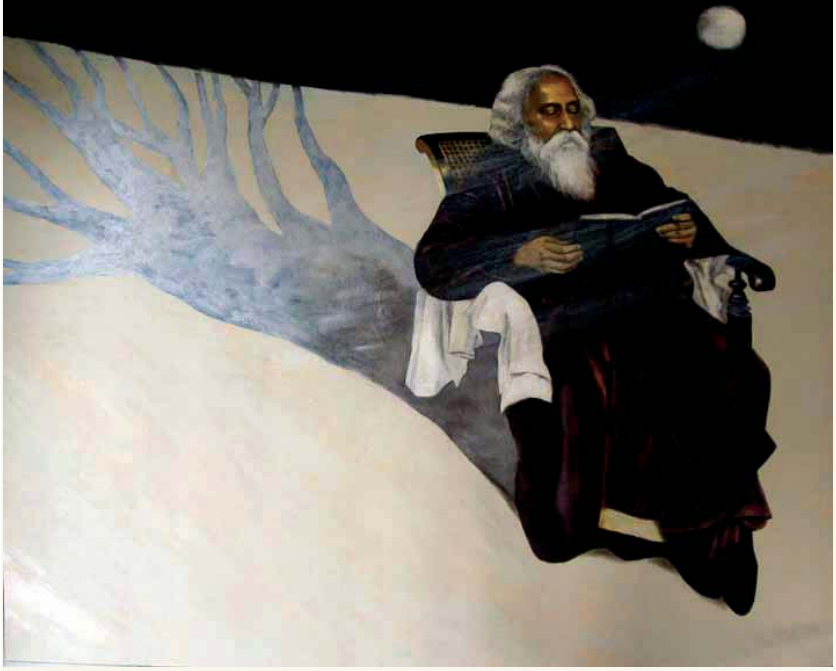

শেষ পাতা

শুভাপ্রসন্নর ছবি

আনিসুজ্জামান

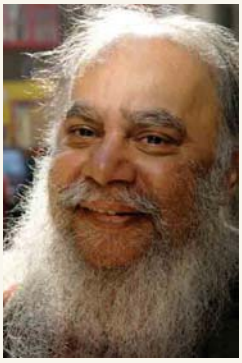

চিত্রাঙ্কনের চার দশক অতিক্রম করেছেন শুভাপ্রসন্ন। ইতোমধ্যে দেশেবিদেশে খ্যাতি ও সম্মান লাভ করেছেন প্রচুর। শুভাপ্রসন্ন ছবির উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করেন চাইনিজ ইংক, কাঠকয়লা, তেলরং ও অ্যাক্রিলিক। তাঁর ছবিতে কালোর প্রাধান্য। কখনো কখনো তার সঙ্গে জুড়েছেন হলুদ বা নীল– প্রায়ই সেই হলুদ হয়েছে লালচে, নীল হয়ে গেছে ঘন কালো। মিশ্র মাধ্যমেও তিনি এঁকেছেন অনেক ছবি– কখনো ক্যানভাসে, কখনো কাগজে।

শুভাপ্রসন্নর ছবির বিষয় প্রধানত আবর্তিত হয়েছে তাঁর প্রিয় নগর কলকাতাকে ঘিরে। এ নগর নিয়ে গর্ব করার যেমন অনেক কিছু আছে, তেমনি আছে শোকপ্রকাশের অনেক কারণ। একটি ছবিতে রবীন্দ্রনাথকে বসে থাকতে দেখা যায় স্বমহিমায়, তবে ঘনীভূত কালোর মধ্যে। অবশ্য তাঁর চুল্লদাড়ি সাদা, দু 'হাতের নিচে সাদা কাপড় উঁকি দিচ্ছে, হাত্তেধরা বই য়ের সাদা পৃষ্ঠা দেখা দিচ্ছে, নীলিমায় প্রায় পূর্ণিমার চাঁদ। কিন্তু আরামকেদারায় আসীন কবির যে ছায়া ছড়িয়েছে পশ্চাতে, তা নিয়েছে নিষ্পত্র বৃক্ষের রূপ। প্রশ্ন জাগতে পারে, কবির সৃষ্টিশীলতার প্রভাব কি ব্যর্থ হয়ে গেল আমাদের জীবনে? শিল্পীর ছবিতে কলকাতার বাড়িঘর লেগে আছে গায়ে গায়ে, নেই সামান্য একটু ব্যবধানও। এই যোগ সহমর্মিতার নয়, একটার ওপর অন্যটার চেপে বসার। একটি ছবিতে দেখা যায়, প্রকা- বাড়িটা কেমন আঁকাবাঁকা, তার গম্বুজের ওপর পাখা বিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছে প্যাঁচা। কোথাও বাড়িঘর একটার ওপরে আরেকটা জুড়ে বসেছে এবং মানুষের আনুপাতিকভাবে অনেক বড় দু'টি হাত ভূগর্ভ থেকে আকাশের দিকে উত্থিত, আর দূরে আকাশে তার ছায়াপাত। আরেকটিতে উচ্চ আদালতগৃহের সামনে আইনজীবী দাঁড়িয়ে আছেন বিকৃত মুখভঙ্গি করে– ইনিই আইকন– চিত্রার্পিত মহাপুরুষ। অন্য আইকনেও বিকার আছে– অনুপাতে, অবয়বে, চাহনিতে।

শুভাপ্রসন্নর ছবিতে আছে ত্রিকালদর্শী প্যাঁচা, তীক্ষ্ণচক্ষু পাখি, সকল প্রতিকূলতার মধ্যেও টিকে থাকা কাক, সুযোগসন্ধানী বিড়াল, পথের ধারের কুকুর, বড় চোখওয়ালা মাছ, গলায় গল্লজড়া নো হাঁস, একরোখা ছাগল, ফুল, প্রজাপতি ও পতঙ্গ– কিন্তু কোনটাই বস্তুধর্মিতার সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়, বরঞ্চ তাদের মধ্যে যে অতিরঞ্জন আছে, যে ভাঙন আছে, তা বিমূর্ততার আভাস দেয়। কবিতায় কবির প্রিয় প্রতীকের মত শিল্পীর ছবিতে এসব প্রাণি ঘুরেফিরে আসে। এদের অবয়ব দেখলেই ধরা যায়, এরা বিশেষ করে শুভাপ্রসন্নরই সৃষ্টি। বোঝা যায়, য়্লেপরি বেশে আমাদের বাস, তার ক্ষয় ও বিকারের দ্যোতক এরা।

শুভাপ্রসন্ন ভাল করেই জানেন যে, এই ক্ষয় ও বিকার কেবল তাঁর প্রিয় নগরের লক্ষণ নয়, সারা পৃথিবীতেই আজ তা ছড়িয়ে রয়েছে। তাঁর একটি ছবির তাৎপর্য আমার কাছে খুব স্পষ্ট নয়, তবে তিনি যে তাঁর দেশকালের সীমা অতিক্রম করে সেখানে দাঁড়িয়েছেন, তাতে সন্দেহ নেই। আরেকটি ছবিতে দেখি, মরুভূমিতে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে রয়েছেন নানা দেশের নানা কালের মনীষীরা: লেওনার্দো, শেকস্পিয়র, মার্কস, লিংকন, আইনস্টাইন, মাও, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, চার্লি চ্যাপলিন, মার্টিন লুথার কিং, মাদার টেরিজা, আরো অনেকে। আর সেই মরুপ্রান্তরে বাঁশিতে সুর তুলছে দুই যুবক্কযুবতী – পৃথিবীর প্রথম মানব্লমানবীর মত আপাদম স্তক নগ্ন। কিছু উপকরণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে চারপাশে: সর্পিণী, লেখনী, অন্নপাত্র। এখানে আদিম কি হয়ে উঠেছে আধুনিক, বিগত হয়ে গেছে সাম্প্রতিক? কে বলতে পারে!

শুভাপ্রসন্ন দৃষ্টিনন্দন ছবি আঁকার দায় স্বীকার করেননি। ক্ষোভের, প্রতিবাদের, ভিন্নমতের সুর ও স্বর শোনা যায় তাঁর কাজে। তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান ঘটমান বর্তমানের দিকে, চান মানুষের ভাগ্যপরিবর্তন করতে। পরিবর্তন করতে হলে সকলের সচেতনতা চাই। তাঁর ছবি আমাদের সচেতন করতে চায়। তার মধ্যে দিয়েই শিল্পী গড়ে তোলেন নিজের নন্দনতত্ত্ব। শ্লোগান দিয়ে নয়, নান্দনিক বোধ নিয়েই পরিবর্তনের দিকে এগোতে চান তিনি।

আনিসুজ্জামান
প্রফেসর অ্যামেরিটাস, প্রাবন্ধিক

১৭ জানুয়ারি, ২০১৪
গুলশানের ইন্দিরা গান্ধী
সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে
বাংলাদেশী ব্যান্ড
এলআরবিএর সংগীত
পরিবেশন

১৮ জানুয়ারি, ২০১৪
গুলশানের ইন্দিরা গান্ধী
সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে
ইউসুফ খানএর
সরোদ পরিবেশন

৩১ জানুয়ারি, ২০১৪
গুলশানের ইন্দিরা
গান্ধী সাংস্কৃতিক
কেন্দ্রে প্রিয়াংকা গোপ-
এর সংগীত পরিবেশন

১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪
গুলশানের ইন্দিরা গান্ধী
সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে ইন্দ্র
মোহন রাজবংশীএর
সংগীত পরিবেশন

Regd. No. DA 355 Bharat Bichitra February 2014

सत्यमेव जयते

ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা

জ্ঞাতব্য তথ্য

ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা এবং সহকারী হাই কমিশন, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীর ভিসা সেবা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই)-কে আউটসোর্স করা হয়েছে। এসবিআই বাংলাদেশে ছয়টি ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপলিকেশন সেন্টার (আইভিএসি) পরিচালনা করে থাকে। এগুলি হচ্ছে: ১. আইভিএসি, গুলশান, ঢাকা, ২. আইভিএসি, মতিঝিল, ঢাকা, ৩. আইভিএসি, চট্টগ্রাম, ৪. আইভিএসি, সিলেট , ৫. আইভিএসি, খুলনা এবং ৬. আইভিএসি, রাজশাহী।

আইভিএসি-তে সকল কর্মদিবসে সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়। ভিসা প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবার পর পাসপোর্ট বিকাল ৩টা থেকে সাড়ে ৭টার মধ্যে ফেরত দেওয়া হয়। আবেদন প্রক্রিয়া ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদির পূর্ণ বিবরণ **www.ivacbd.com** এবং **www.hcidhaka.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে ।

হেল্পলাইনসমূহ: আইভিএসি, গুলশান, ঢাকায় আপৎকালীন প্রয়োজন মেটানোর বিশেষ ব্যবস্থা আছে। এখানে চিকিৎসা ও অন্যান্য জরুরি পারিবারিক প্রয়োজন সংক্রান্ত ভিসা আবেদন গ্রহণের জন্যে একটি কাউন্টার রয়েছে।

আইভিএসি, গুলশান-এর হেল্পলাইন ডেস্ক: ই-মেইল: info@ivacbd.com, এবং visahelp@ivacbd.com; ফ্যাক্স: +৮৮০২ ৯৮৬৩২২৯; টেলিফোন: +৮৮০২ ৮৮৩৩৬৩২, +৮৮০২ ৯৮৯৩০০৬ (রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে বিকাল সাড়ে ৫টা)

ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকার ভিসা হেল্পলাইন ডেস্ক: ই-মেইল: visahelp@hcidhaka.gov.in; টেলিফোন: +৮৮০২ ৯৮৮৮৭৯২ (রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে বিকাল সাড়ে ৫টা)

জনসাধারণের জন্য জ্ঞাতব্য:

- ভারতীয় ভিসা পেতে বাংলাদেশের নাগরিকদের কোনও ভিসা ফি দিতে হয় না। আইভিএসি প্রক্রিয়া ফি বাবদ আবেদনপত্র পিছু যে চারশত টাকা নেয়, তা ফেরতযোগ্য নয়।
- ভিসা আবেদনপত্রে প্রদত্ত সকল তথ্যের নির্ভুলতার ব্যাপারে আবেদনকারী দায়ী থাকবেন।
- আবেদনপত্রে যে কোন ভুলের জন্য আবেদনপত্র অগ্রহণযোগ্য হতে পারে।
- আবেদনপত্রের সঙ্গে সদ্যতোলা ছবি (৩ মাসের বেশি পুরনো নয়) সংযোজন করতে হবে।
- আবেদনকারী ভারতভ্রমণে কোন্ শ্রেণীর ভিসা চান তার উলেখ করতে হবে–
  ১. মনে রাখতে হবে যে, একান্ত জরুরি না হলে ট্যুরিস্ট ভিসায় ভারতে গিয়ে চিকিৎসা করানোর অনুমতি নেই।
  ২. নিয়মিত ও পূর্ব-নির্ধারিত চিকিৎসা সেবার জন্য কেবল মেডিক্যাল ভিসার জন্যই আবেদন করতে হবে।
  ৩. রোগীর সঙ্গে মাত্র ৩ জন মেডিক্যাল এটেনডেন্ট যেতে পারবেন এবং তাঁদের একত্রে ভিসার আবেদন করতে হবে।
  ৪. ব্যবসায়ের জন্য ভারতে যেতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে বিজনেস ভিসার জন্য আবেদন করতে হবে।
- ভুল তথ্য-উপাত্ত সংক্রান্ত কাগজপত্র প্রদানের জন্য আবেদনকারীরাই দায়ী থাকবেন।
- আবেদনপত্র জমা নেওয়ার সঙ্গে ভিসাপ্রাপ্তির কোন নিশ্চয়তা নেই। যে কোনও সময় কোন কারণ ছাড়াই ভিসা প্রত্যাখ্যাত হতে পারে।

উপরোক্ত নিয়মাবলী পালন করলে ভিসাপ্রাপ্তি সহজ হবে।

জনস্বার্থে ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা কর্তৃক প্রচারিত